KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ১১/১ ১১/২ ১১/৩ ১১/৪	Year of Publication : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫ কার্তিক-পৌষ ১৩৫৫ মাঘ- চৈত্র ১৩৫৫ Condition : Brittle : Good
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, বিডন রো, কলকাতা-৭০০০০৯

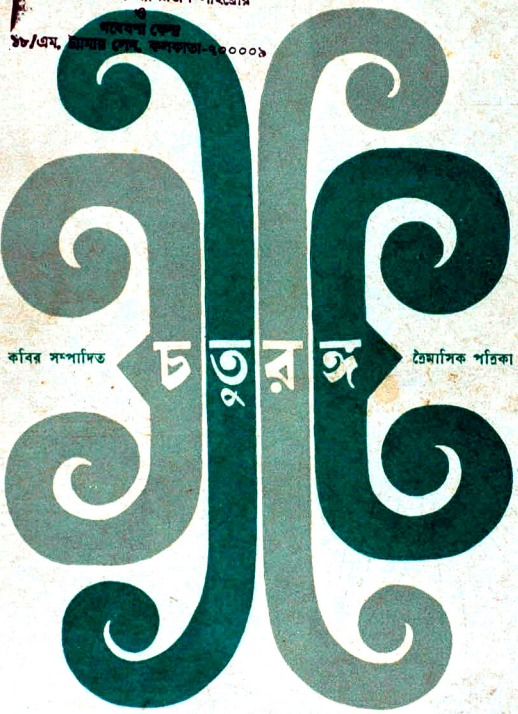

১৮৬৭
খৃষ্টাব্দ
হইতে
ভারতের সেবায়
নিয়োজিত

বামার লরী

কলিকাতা • বোম্বাই • নিউ দিল্লী • আসানসোল

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

পরিচয়

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

॥ সূচীপত্র ॥

জওহরলাল নেহরু ॥ অতীত ও বর্তমানের ভারত ১
অমলেন্দু বসু ॥ কাব্যপ্রত্যয় ২৪
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ মামলা ৩৮
মনীশ ঘটক ॥ আজ সে ঘুমোক ৪০
মনীশ ঘটক ॥ হাস্‌লে যে টোল পড়ে গালে ৪১
বিষ্ণু দে ॥ চার স্রোত ৪২
বিষ্ণু দে ॥ রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ৪৩
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন ৪৪
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ একটি বিচিত্র রজনী ৬০
অতীন্দ্রনাথ বসু ॥ নৈরাজ্যবাদ : প্রজ্ঞানযুগ ৬৭
আলবেয়ার কামু ॥ অচেনা ৮১
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ॥ আধুনিক সাহিত্য ৮৭
সমালোচনা—অশোক মিত্র, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,
জীবেন্দ্র সিংহরায়, নৃপেন্দ্র সান্যাল ৯৪

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ঐক্য ও সমন্বয়ের সাধনায় ...

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের—বহুর মধ্যে সমন্বয়-সাধনের সফল সাধনাই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মর্মবাণী। এই মর্মবাণীই নিহিত রয়েছে তার ব্যাপক, বিচিত্র, কখনও বা ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি ও শিল্প-কলার মধ্যে।

হিমালয়ের যে পার্বত্য পৌরুষ বন্যম নৃত্যে উদ্দীপিত, সমতল-বাসিনী রসকলি-লাঞ্ছিত তরুণীদের রাসনৃত্যে ও মৃদঙ্গের বোলে বা বাউল ও কীর্তনে তা স্তিমিত ও ভাবনত। উড়িষ্যার ছউ বা মধ্য ভারতের লাম্বাডি নৃত্যে, গুজরাটের গরবা বা দক্ষিণ ভারতের ভারতনাট্যম্ ও কথাকলি নৃত্যে এই বিচিত্র ভিন্নধর্মী সংস্কৃতিরই আত্মপ্রকাশ।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই বিচিত্র, ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির ঐক্য ও সমন্বয় সাধনের প্রয়াসই রূপায়িত।

পূর্ব রেল ও য়ে

একবিংশতিতম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

ছত রঙ্গ

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৬

অতীত ও বর্তমানের ভারত

জওহরলাল নেহরু

প্রথমেই কৈফিয়ত দিয়ে শুরু করতে চাই। বহুকাল ধরে আমি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং প্রায়ই জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা দিয়ে থাকি, কিন্তু আজ যে ধরনের বক্তৃতা আমার দেবার কথা, তাতে আমি সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। এ ধরনের বক্তৃতা চিন্তাশীল ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ হওয়া উচিত, যথেষ্ট সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে তা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এ রকম ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতার অভাব তো আছেই; তা ছাড়া এখন পার্লামেণ্টের বাজেট-অধিবেশন চলছে। আমার দৈনন্দিন কাজকর্মও রয়েছে যার জন্যে অনেকখানি সময় ব্যয় করতে হয়। কাজেই আজকের এ অনুষ্ঠানের প্রতি আমি সুবিচার করতে পারি নি।

এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমি ইতস্তত করেছিলাম, কিন্তু এক দুর্বল মুহূর্তে সম্মতি দিয়ে ফেলেছি। আজ মওলানা আজাদের মৃত্যু-বার্ষিকী। তাঁর স্মৃতি আমাদের কাছে প্রিয়। সেই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই এ দায়িত্ব আমি স্বীকার করেছি। তা ছাড়া, যে বিষয়ে বলবার জন্যে আমার কাছে প্রস্তাব করা হয় তাও আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে; কোনো না কোনোরূপে ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আমার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। সেই সঙ্গে একটু আশঙ্কাও আমার ছিল। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি বর্তমান ভারতবর্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত; ফলে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমস্যার বিচার আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ধরনের বক্তৃতার এই আমার প্রথম প্রচেষ্টা; বিরাট কাজের চাপ এবং অন্যান্য অবস্থার টানাটানির মধ্যে এ বক্তৃতা আমায় তৈরী করতে হয়েছে। কাজেই শ্রোতাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

আজকের ভারতবর্ষকে বোঝবার এবং বর্ণনা করবার চেষ্টা করতে গেলে সাহস দরকার, আর আগামীকালের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে তা প্রায় হঠকারিতা করা হয়। ইতিহাসে আর কখনই একটি দেশ বা বিশ্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা আজকের মতো কঠিন ছিল না। ঘটনা প্রবাহ এখন অবিশ্বাস্য গতিতে ধাবমান, এক পরিবর্তনের পরেই আসছে আর এক পরিবর্তন। গভীরের অগণিত স্রোতকে রাজনীতির তুচ্ছ আবরণ আবৃত করে রেখেছে, সেগুলি মাঝে মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সব কিছুর চেহারা ওলটপালট করে দেয়।

আজকের ভারতবর্ষ শুধু অব্যবহিত অতীত থেকেই জন্মায় নি, হাজার হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে তার উদ্ভব। চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও কর্মের বহু স্তরের প্রভাব আমাদের উপর পড়েছে এবং তাই থেকেই আজ আমাদের এই পরিণতি। ভারতবর্ষে আমার যাঁরা সমকালীন তাঁরা এক ঘটনা-পরম্পরার প্রভাবে বিশেষভাবে গড়ে উঠেছেন। যে সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। আমরা শুধু যে এক বিরাট পুরুষ এবং মহানায়কের সংস্পর্শে এসেছিলাম, যিনি আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে নাড়া দিয়েছেন, ওলট পালট করে দিয়েছেন জীবনকে এবং চিরাচরিত জীবনযাত্রার গণ্ডী থেকে আমাদের টেনে বাইরে এনেছেন তাই নয়, আমরা ইতিহাসের বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছি এবং তাতে অংশ নিয়েছি। সমস্ত সত্তা যখন উত্তেজনায় টনটন হয়ে ওঠে, আবেগে উদ্বেলিত হয় এমন অনেক মুহূর্ত আমরা বারম্বার আস্বাদ করেছি; কখনো কখনো তার প্রতিক্রিয়াও অনুভব করেছি ব্যর্থতায়, প্রায় হতাশার আস্বাদ পেয়েছি। অবশ্য এ অভিজ্ঞতার মধ্যে তফাৎ আছে, কারণ দারুণ স্নায়বিক উত্তেজনার পর সাধারণত মানসিক ও শারীরিক অবসাদের যে অনুভূতি আসে তা আমাদের স্পর্শ করেনি। আশা রাখবার মতো একটা কিছু সব সময়েই আমাদের ছিল—ছিলেন পাহাড়ের মতো, অন্ধকারে দীপস্তম্ভের মতো একজন নেতা, একটি আন্দোলন যাতে আমরা রোমাঞ্চিত হতে পারতাম, যা আমাদের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অংশগুলিকে উৎসারিত করত। ঐ মুহূর্তগুলি সব সময় যে সুখের ছিল তা নয়, কখনো কখনো দুঃখেরই ছিল; কিন্তু একটা তৃপ্তির অনুভূতি সর্বদাই আমরা বোধ করেছি, জেনেছি যে আমরা বিরাট কোনো কর্মে নিযুক্ত রয়েছি, আমরা ইতিহাসের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছি। চিন্তা ও কর্মের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না, তার ফলে এক পরিপূর্ণ জীবনানুভূতির সৃষ্টি হত। সব চাইতে এই একটি বিশ্বাস আমাদের বাঁচিয়েছিল, এমন কি রাজনীতির ব্যাপারেও আমরা নীতি মেনে, মহৎ আদর্শ নিয়ে কাজ করে চলেছি। বিরোধের ক্ষেত্রে বিশেষত স্বাধীনতা সংগ্রামে, হিংসা মানুষকে যেমন গ্রাস করে, আমাদের তা করে নি।

আমাদের সামনে, আমাদের মনের মধ্যে গান্ধীজী সব সময়েই ছিলেন। অন্যেরাও ছিলেন, বিরাট সব মানুষ তাঁরা। আর ছিল অগণিত নরনারীর মধ্যে সখ্য; মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে এবং মহৎ এক নেতার সঙ্গে ছিলেন বলে তাঁরাও চারিত্র্যে উন্নত হয়ে উঠেছিলেন। মওলানা আজাদ সেই সব বিরাট মানুষদের মধ্যে একজন ছিলেন, বয়সে তখন তিনি নবীন কিন্তু সর্বদা তাঁকে আমরা জ্ঞানবৃদ্ধ, প্রবীণ বলে সম্মান করতাম। আমাদের আন্দোলনে তিনি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে ছিলেন এবং অন্য যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে তিনিই ছিলেন আমাদের কাছে সেই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রতীক যে সমন্বয়ের প্রয়াস ভারতবর্ষ চিরকাল করে এসেছে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের পথ থেকে তিনি আমাদের নিষ্ক্রান্ত হতে সাহায্য করেছিলেন, আমাদের দৃষ্টিকে তিনি প্রসারিত করেছিলেন। এতগুলি মানুষ যে নিজেদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য সত্ত্বেও এক নিবিড় ঐক্য আবিষ্কার করেছিলেন এবং পুরো এক যুগ ধরে একত্রে কাজ করতে পেরেছিলেন, এ-এক আশ্চর্য ঘটনা।

২

ভারতবর্ষের স্বরূপ কী? এ প্রশ্ন বারবার আমার মনে জেগেছে এবং আমি আমার সাধারণ বুদ্ধির বিবেচনা অনুযায়ী ভারতের অতীত এবং তার বর্তমানের মধ্যে এ প্রশ্নের

উত্তর খুঁজেছি। আমাদের ইতিহাসের আদিযুগ আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। সে এক বলিষ্ঠ বীর্যবান জাতির অতীত ইতিহাস; যার মনে ছিল প্রখর জিজ্ঞাসা, অবাধ অনুসন্ধানের আগ্রহ এবং জ্ঞাত ইতিহাসের আদি পর্বেও সে জাতি এক পরিণত ও সহনশীল সভ্যতার চিহ্ন রেখে গেছে। জীবনকে এবং জীবনের আনন্দ-বেদনাকে মেনে নিয়ে সে সর্বদা সন্ধান করছিল পরমের এবং বিশ্বজনীনের। সংস্কৃতের মতো অপূর্ব একটি ভাষা গড়ে উঠেছিল তাদের হাতে। এই ভাষা এবং শিল্প ও স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে তাদের প্রাণস্পন্দমান বাণী প্রেরণ করত দূর দূরান্তর দেশে। এই ভাষা জন্ম দিয়েছিল উপনিষদের, গীতার এবং বুদ্ধের।

একটা জাতির ইতিহাসে সংস্কৃতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পৃথিবীর আর কোনো ভাষা গ্রহণ করেছে কিনা সন্দেহ। সংস্কৃত যে শুধু উচ্চতম চিন্তার এবং উৎকৃষ্ট সাহিত্যের বাহন হয়েছিল তাই নয়, ভারতবর্ষের পক্ষে তা হয়ে দাঁড়ায় ঐক্যের সূত্র, যদিও রাজনীতিক যথেষ্ট অনৈক্য ছিল। হাজার হাজার বছর ধরে রামায়ণ ও মহাভারত প্রতি যুগে কোটি কোটি মানুষের জীবন-ছন্দে গ্রথিত হয়ে গেছে। আমি অনেক সময় ভেবেছি, আমাদের জাতি যদি বুদ্ধকে এবং উপনিষদ ও মহাকাব্যগুলিকে ভুলে যায় তাহলে তার কেমন রূপ হবে। তাহলে সে উন্মূল হয়ে পড়বে, যে সব মৌল বৈশিষ্ট্য তাকে চিহ্নিত করেছে এবং যুগের পর যুগ তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে সেগুলি সে হারাবে। ভারতবর্ষ আর ভারতবর্ষ থাকবে না।

৩

ক্রমশ অধঃপতন শুরু হল। চিন্তা তার সজীবতা হারিয়ে স্বাদহীন হয়ে পড়ল, উচ্ছল ও প্রাণময় যৌবনের স্খলাভিষিক্ত হল কোপনস্বভাব বার্ধক্য। নিত্য নব অন্বেষার পরিবর্তে এল প্রাণহীন নিয়মচক্র। উদার প্রেরণাদায়ক বিশ্ববীক্ষা গণ্ডিবদ্ধ হয়ে হারিয়ে গেল জাতিবর্ণভেদ ও সংকীর্ণ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে। তা সত্ত্বেও যথেষ্ট প্রাণশক্তি ভারতবর্ষের ছিল যার ফলে সে তার বিশাল মানব-সাগরে সমাগত বিভিন্ন মানুষের ধারাকে আত্মসাৎ করে নিতে পারল। উচ্ছল যৌবনের দিনে যেসব চিন্তা তাকে নাড়া দিয়েছিল তা সে কখনো একেবারে ভুলে গেল না।

পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ইসলাম এবং মুসলমান অভিযানের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়। তারপর আসে পশ্চিমের ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গ। তারা নতুন এক আধিপত্য, নতুন এক উপনিবেশবাদ নিয়ে আসে এবং সেই সঙ্গে নিয়ে আসে নতুন চিন্তার ও ইয়োরোপে প্রসারশীল শ্রমশিল্প-সভ্যতার প্রভাব। দীর্ঘ সংগ্রামের পর এই অধ্যায় স্বাধীনতায় পরিণতি লাভ করে। এখন আমরা অতীতের এই সমগ্র ভার নিয়ে ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়েছি; যে ভবিষ্যৎকে আমরা গড়তে চাইছি তার এলোমেলো স্বপ্ন আর চাঞ্চল্য আমরা অনুভব করছি। আজ আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং আমাদের দেশের মধ্যে এই সব বিভিন্ন যুগই প্রতিফলিত। আধুনিক যুগের প্রতীক হল সংগঠিত শক্তি। পারমাণবিক বিজ্ঞান এবং পারমাণবিক শক্তি আমাদের ভারতবর্ষে অগ্রসর হচ্ছে, সেই সঙ্গে গোময়-যুগও এখানে রয়েছে। এইভাবে অতীতের প্রতিটি শতাব্দী আমাদের দেশে প্রতিফলিত। উপরন্তু রয়েছে এক বিশাল বৈচিত্র্য। তথাচ এ বৈচিত্র্যের পিছনে রয়েছে ঐক্য, যা আমাদের

জনসাধারণকে দুর্ভাগ্য ও দুর্বিপাক সত্ত্বেও যুগের পর যুগ একত্র ধরে রেখেছে। আমরা বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির জগতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি এবং প্রকৃতির শক্তি নিচয়কে যাতে আরো বেশী করে কাজে লাগানো যায় তারজন্য আমাদের জ্ঞানকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছি। শুধু যে দারিদ্র্য এবং অনুন্নত অবস্থাই আমাদের পিছনে টেনে রেখেছে তা নয়, উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত কিছু সংস্কার এবং নিয়মনিষ্ঠাও বাধার সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞান ও টেকনলজিকে বাদ দিয়ে আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সেই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি আমাদের অতীতকে উপেক্ষা করি বা বিস্মৃত হই তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ হবে শূন্যগর্ভ ও অগভীর, কোনো যথার্থ তাৎপর্য তার থাকবে না।

৪

বর্তমান যুগের হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমরা দুই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি—ভবিষ্যতের দিকে এবং অতীতের দিকে। দুই দিকেই আমাদের সমান আকর্ষণ। কি ভাবে আমরা এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাব? কি ভাবে জীবনকে গড়ব যাতে আমাদের বৈষয়িক প্রয়োজন মিটবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের হৃদয় ও মন সঞ্জীবিত থাকবে? কোন নতুন আদর্শকে অথবা নতুন জগতের উপযোগী হতে পারে এমনভাবে পরিবর্তিত কোন্ পুরোনো আদর্শকে আমরা জনসাধারণের সামনে ধরব? কি ভাবে তাদের আমরা সচেতনতায় ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করব?

ভারতবর্ষে আমাদের নিজস্ব সব সমস্যা রয়েছে। কিন্তু জগতের বৃহৎ সমস্যাগুলিও আমাদের সমস্যা। এ জগৎ তার বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। ভারতবর্ষে আমরা বর্তমানে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপৃত আছি। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্যে এক বিরাট প্রচেষ্টায় আমরা ব্যস্ত। অন্য যে কোনো রকম অগ্রগতির পক্ষে এ প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য। কিন্তু একটা সন্দেহ আমাদের মনে উদয় হয়। শুধু এই যথেষ্ট, না, আরও কিছু করা প্রয়োজন? কল্যাণ-রাষ্ট্র এক মহৎ আদর্শ, কিন্তু তা তো নীরস বিবর্ণও হতে পারে। যে সব রাষ্ট্র ঐ লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে তারাও নতুন নতুন সমস্যা ও সংকটের সৃষ্টি করে, যার সমাধান শুধু বৈষয়িক অগ্রগতি বা যান্ত্রিক সভ্যতা দ্বারা হয় না। মানব-প্রকৃতির কতকগুলি মৌল প্রয়োজন পূরণে ধর্মের এক প্রধান ভূমিকা ছিল। কিন্তু এই ধরনের ধর্মের প্রভাব আজ শিথিল হয়ে পড়েছে। তা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের আঘাত প্রতিরোধ করতে পারছে না। ধর্ম প্রয়োজনীয় হোক বা না হোক, কোনো একটা মহান আদর্শে বিশ্বাস থাকা অত্যাবশ্যক। এ বিশ্বাস এমন হওয়া প্রয়োজন যা আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করবে এবং আমাদের একত্রে সংঘবদ্ধ রাখবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বৈষয়িক ও শারীরিক দাবীর ঊর্ধ্বে কোনো একটা উদ্দেশ্যবোধ আমাদের থাকা দরকার।

সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম এই উদ্দেশ্যবোধ দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তারাও যুক্তিনিরপেক্ষ অনড় মতামত প্রবর্তনের প্রবণতা দেখিয়েছে। কমিউনিস্টরা বর্তমান যুগের পরমার্থবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রত্যেক সমাজই একটা ভারসাম্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করে। কখনো তা সংঘাতের মধ্যে দিয়ে, কখনো বা সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে পূর্ব সংকল্পিত অচেতন প্রয়াস দিয়ে।

আদিম কোনো সমাজ বেশী বদলায় না, একটা বাঁধা রাস্তা ধরে চলে; এই কারণে একটা নীচু স্তরের ভারসাম্য তার থাকে। গতিশীল সমাজ আততি (tension) সৃষ্টি করে, যেমন ব্যষ্টির মধ্যে তেমন সমষ্টির মধ্যে। এ যদি সত্য হয় তাহলে পৃথিবীতে বর্তমানের সব আততি এক প্রচণ্ড গতিশীলতার দ্যোতক, মানব-অস্তিত্বে নতুন এক ভারসাম্য এবং নতুন এক বেধ (dimension) আনবার চেষ্টার পরিচায়ক। এতে আমাদের উৎসাহিত-বোধ করারই কথা। কিন্তু সব সময় মনে এই ভয় যে পারমাণবিক যুগের অন্তর্সম্ভার সমগ্র মানব জাতিকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে।

ভবিষ্যতের দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে; বিশ্বাস ও উদ্যম নিয়ে সার্থক উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতের জন্যে কাজ করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের অতীত উত্তরাধিকারকে বজায় রাখতে হবে এবং তা থেকে বাঁচবার খোরাক আহরণ করতে হবে। পরিবর্তন প্রয়োজন, কিন্তু ধারাবাহিকতাও আবশ্যক। অতীত ও বর্তমানের ভিত্তির উপর ভবিষ্যৎকে গড়তে হবে। অতীতকে অস্বীকার করা এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার অর্থ হল নিজেদের উন্মূল করে ফেলা, রসহীন বিশুষ্ক হয়ে যাওয়া। গান্ধীজীর গুণ ছিল এই যে, তিনি আমাদের দেশ ও জাতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে নিজেকে দৃঢ়নিবদ্ধ রাখতেন এবং সেই সঙ্গে বৈপ্লবিক স্তরে কাজ করতেন। অনেকে এই বলে তাঁর সমালোচনা করত যে তিনি সেকেলে অর্থনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করেছেন কিংবা এক ধরনের ঐতিহ্যবাদকে সমর্থন করছেন, এমন কি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে উৎসাহ দিচ্ছেন। কিন্তু তবু যদি কেউ তাঁর কার্যকলাপের বিশাল পরিধি বিবেচনা করে দেখে তাহলে তাদের বৈপ্লবিক পরিণাম তাকে অভিভূত করবে। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর কার্যকলাপ দেখলে একথা বুঝতে অসুবিধে হয়, কারণ আমরা মানুষ হয়েছি সংঘাতের পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে। তিনি জানতেন যে সত্যাগ্রহ বিপ্লব জনসাধারণের মধ্যে থেকে আসে, উপর থেকে নয় এবং বিপ্লব মূলত সামাজিক। তাঁর আগে বহু বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কারক এসেছিলেন, তাঁরা ছোটখাট পরিবর্তন ঘটাতে বা নতুন সম্প্রদায় গড়তে পেরেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী রামরাজ্যের কথা বলে লক্ষ লক্ষ গৃহে বিপ্লব আনেন, অথচ লোকে পুরোপুরি বুঝতে পারিনি কি ঘটছে। তিনি বর্ণভেদকে কদাচিৎ নিন্দা করেছেন (যদিও শেষের দিকে কিছু করেন); কিন্তু অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে তিনি সমগ্র বর্ণাশ্রমকেই হীনবল করে ফেলেন। পরিণাম জেনেই তিনি এরকম করেন। তাঁর রাজনৈতিক কর্মরীতির দ্বারা তিনি কোটি কোটি লোককে সক্রিয় করে তোলেন, তাদের মন থেকে ভয় দূর করেন এবং তাদের মধ্যে আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা সঞ্চারিত করেন। সমাজে যারা সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত, যারা দারিদ্র্য-পীড়িত, তাদের প্রতি মনোযোগ দিয়ে তিনি আমাদের সামাজিক ন্যায়বিচারের দিক থেকে চিন্তা করতে বাধ্য করেন। এ সমস্তই তিনি শান্ত নিরুত্তেজভাবে করেন এবং বিরোধিতাকে বহুল পরিমাণে এড়িয়ে চলেন। সব চেয়ে বড় কথা, তিনি জোর দেন সত্য এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ের উপর। বস্তুত, সত্য তাঁর কাছে জীবনধারণের এক শর্ত হয়ে দাঁড়ায়; তাঁর প্রবল কর্মতৎপরতা সর্বদা সত্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। যে মূলনীতি অতীতে আমাদের জাতিকে উন্নত করেছিল তার স্মৃতি এই আচরণ দ্বারা তিনি জনসাধারণের মনে জাগ্রত করেন। এইভাবে প্রাচীন ভিত্তির উপরই তিনি নতুন সৌধকে ভবিষ্যৎমুখী করে গড়েন। অর্থনীতি বা অন্য বিষয়ে তাঁর কোনো কোনো মত যে আধুনিক চিন্তার সঙ্গে খাপ খায় না বা তাদের তাৎপর্য যে নেহাৎ সাময়িক, এ নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। সব সময়েই তিনি পরিবর্তমান

অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে প্রস্তুত থাকতেন, অবশ্য যদি না তার ভিত্তিতে কোনো গলদ থাকত।

তিনি যে ভাবে অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে এমন কি ভবিষ্যতের সঙ্গে গ্রথিত করতেন তা সব সময়েই আমার কাছে আশ্চর্য লেগেছে এবং তা করতে পারতেন বলেই তাঁর দেশ-বাসীকে তিনি এক পা এক পা করে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সংঘাতকে বহুলাংশে পরিহার করতে সমর্থ হন। সব চেয়ে বড় যে শিক্ষা তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন বা আমাদের স্মরণে আনেন তা হল উপায়ের গুরুত্ব। লক্ষ্য কখনই আপনাতে যথেষ্ট নয়, কারণ লক্ষ্য সাধনে যে উপায় অবলম্বন করা হয় তার দ্বারাই লক্ষ্য বিশেষ রূপ পায়। এই নীতির মধ্যে এবং তাঁর কার্যপদ্ধতির মধ্যে যদি কোনো মূল সত্য থেকে থাকে তাহলে তাঁর স্থাপিত ভিত্তির উপরই আমাদের গড়ে যেতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি যা কিছু বলে গেছেন বা করে গেছেন আমরা তার দাসসুলভ অনুসরণ করব। আমাদের জীবনের একটা বিশেষ অধ্যায়ে হয়তো তা উপযোগী ছিল কিন্তু আজ আর তা উপযোগী নয়। পরিবর্তমান অবস্থার সঙ্গে আমাদেরও নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে; কিন্তু আগের মতোই মূল নীতির দ্বারা আমাদের চালিত হতে হবে।

৫

রাজনৈতিক বিজয়ের রূপে ইসলাম যখন ভারতবর্ষে এল তখন নিয়ে এল সংঘাত। এর দুটো পরিণাম দেখা দিল। একদিকে, হিন্দু সমাজকে আরও গুটিয়ে নেবার প্রবণতাকে ইসলাম বাড়িয়ে দিল; অন্যদিকে, এক ঝলক নতুন বাতাস ও নতুন চিন্তাধারা সে নিয়ে এল এবং তার ফলে এক যৌবন-সঞ্চারী প্রভাব বিস্তার করল। হিন্দু সমাজ এক অচলায়তনে পরিণত হয়েছিল। ভারতীয় চিন্তার আর এক বিরাট অবদান বৌদ্ধ ধর্ম থেকে এ বিষয়ে সে ছিল একেবারে আলাদা। বহিরাগত মুসলমানরাও নিজেদের অচলায়তন সঙ্গে করে নিয়ে এল। এইভাবে দুই অচলায়তন পরস্পরের সম্মুখীন হল—একে অপরকে উচ্ছেদ বা দমন করবার মতো শক্তিশালী ছিল না। রাজনৈতিক জয়ের দ্বারা মানসিক, নৈতিক বা ধর্মীয় জয় এল না। নতুন প্রভাবকে প্রতিরোধ করবার মতো শক্তি ও দৃঢ়তা প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে তখনও ছিল। মুসলমানরা আসে তাদের যৌবনদীপ্ত বাণী নিয়ে, কাজেই তাদের সহজে আত্মসাৎ করা গেল না, যেমন পূর্বেকার আগন্তুকদের করা গেছিল। পক্ষান্তরে তারাও ভারতীয় জনসাধারণের মূল প্রকৃতিকে বদলাতে পারল না। এর ফলে মধ্যযুগে ভারতের সামনে এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। সে সমস্যা হল, কিভাবে দুই দৃঢ়মূল অচলায়তন পরস্পরের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলবে। আকবর এবং অন্য বিজ্ঞ শাসকরা উপলব্ধি করেন যে ভবিষ্যতের একমাত্র আশা হল কোনো এক ধরনের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা।

প্রাচীন হিন্দুদের দর্শন ও বিশ্ববীক্ষা আশ্চর্যরকম সহনশীল ছিল; তবু তারা নিজেদের বহু বর্ণ-গোষ্ঠী ও শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল। মুসলমানদের এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় : কি করে তারা অন্যদের সঙ্গে সমান হয়ে জীবন যাপন করবে? অন্য যে সব দেশে তারা গেছিল সেখানে তারা এমন বিপুল সাফল্যলাভ করেছিল যে এই সমস্যা দেখা দেয়নি। খ্রীষ্টীয় জগতের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়েছিল এবং শত শত বছরে এ

সমস্যার কোনো মীমাংসা সম্ভব হয়নি। ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে এক সমন্বয় গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই অন্যান্য প্রভাব এসে দেখা দেয়। পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলি শ্রমশিল্প গড়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা ভাবতে শিখল অন্যদের চেয়ে তারা শ্রেষ্ঠ। ফলে তারা পৃথক হয়ে বাস করতে থাকে এবং তাদের শাসনাধীন লোকদের অবজ্ঞা দেখাতে লাগল। ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের যে রকম বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়, সে রকম ব্যবধান হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কখনও ছিল না।

এই প্রথম ভারতবর্ষ দূর দেশ থেকে পরিচালিত ঔপনিবেশিক শাসন ও নিয়ন্ত্রণের অধীন হল। ইতিপূর্বে যেসব আক্রমণকারী ও বিজেতা ভারতবর্ষে এসেছিল তারা ভারত-বর্ষকেই নিজেদের বাসভূমি করেছিল, অন্যত্র তাকায়নি; মূলত তারা ভারতীয়রই হয়ে যায়। এবার হল এক নতুন ধরনের আক্রমণ, যা ভারতবর্ষে কোনো শিকড় গাড়তে পারল না। এদের এবং দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে, সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক বা অন্য কিছু হোক, এক অনতিক্রমনীয় প্রাচীর খাড়া হল।

তবু পশ্চিমের নতুন উদারনৈতিক চিন্তা এবং শিল্প-পদ্ধতি ভারতবর্ষের জীবন ও মনকে প্রভাবিত করতে আরম্ভ করল। এক নতুন জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হল। এ জাতীয়তাবাদ অপরিহার্যভাবে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা দাবী করল, অথচ সেই সঙ্গে পশ্চিমের নতুন শিল্প-সভ্যতা এবং পশ্চিমের ভাষা, সাহিত্য ও রীতিনীতির দ্বারা ক্রমশ প্রভাবিত হতে থাকল। এ প্রভাব প্রধানত দেশবাসীর উচ্চস্তরে সীমাবদ্ধ হল, অধিকাংশ লোক গভীরতর দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হতে লাগল।

রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হল। তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং আধুনিক ধারার মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করলেন। বিবেকানন্দ লুপ্ত ভারতীয় চিন্তার পুনরুদ্ধার করলেন এবং তাকে আধুনিক বেশ পরালেন। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠল এবং পরিণতি পেল গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথে।

ইয়োরোপে বিজ্ঞান ও সনাতন ধর্মের মধ্যে নিদারুণ সংঘাত বেধেছিল। খ্রীষ্ট ধর্মের ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে মোটেই খাপ খায়নি। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান সে সংঘর্ষের মনোভাব সৃষ্টি করেনি, ভারতীয় দর্শন নিজের মূল প্রত্যয়ের কোনো ক্ষতি না ঘটিয়েই তাকে সহজে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সামাজিক গঠন আধুনিক ধারার সঙ্গে ক্রমেই বেশী পরিমাণে অসমঞ্জস হয়ে উঠতে থাকে।

অন্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও দুটি শক্তি বিকাশ লাভ করল—জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রেরণা। সমাজতন্ত্রবাদ এবং মার্কস্‌বাদ এই সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর কথা ছাড়াও জনগণের আবেগকে তারা প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। শ্রমশিল্প-বিস্তারের প্রথম আমলে পশ্চিম ইয়োরোপে যে মর্মন্তুদ অবস্থা বিদ্যমান ছিল, মার্কস্ মূলত তার জন্যেই বিচলিত হন। সে সময় রাষ্ট্রের কোনো সত্যকার গণতান্ত্রিক গঠন ছিল না এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কোনো পরিবর্তন আনা প্রায় অসম্ভব ছিল। সুতরাং, বৈপ্লবিক হিংসাই ছিল পরিবর্তনের একমাত্র পথ। অতএব মার্কস্‌বাদ অপরিহার্যভাবে হিংস-বিপ্লবের কথাই ভাবল। তাছাড়া, ইয়োরোপের ঐতিহ্যেই এটা ছিল। তারপর অবশ্য রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিস্তারলাভ করেছে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। উপরন্তু বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির বিরাট অগ্রগতির ফলে বৈষয়িক সমৃদ্ধি সকলের নাগালের মধ্যে এসেছে। ধনতন্ত্রবাদের রূপও অনেক বদলে

গেছে, যদিও তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো এবং একচেটিয়া কারবার ও অর্থনৈতিক শক্তি সমাহারের প্রবণতা বজায় রয়েছে। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক গঠন, সংগঠিত শ্রমিক-শক্তি এবং সর্বোপরি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রেরণা এবং বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির অগ্রগতি এই রূপান্তর ঘটিয়েছে। আজ আমরা এমন সব ধনতান্ত্রিক দেশ দেখতে পাচ্ছি যারা তাদের সমস্ত জনসাধারণের জন্যে অতি উচ্চ জীবনযাত্রার মান প্রবর্তন করেছে।

আমরা এও দেখতে পাচ্ছি যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিপুলভাবে বেড়েছে এবং বৈজ্ঞানিক ও টেক্‌নলজি সংক্রান্ত উন্নতিও হয়েছে অসাধারণ। এটা প্রধানত হিংসা দ্বারা সম্ভব হয়েছে বললে ঠিক হবে না। অন্যান্য রাষ্ট্র-ব্যবস্থাতেও যথেষ্ট হিংসা ঘটেছে। তবে আমি মনে করি, এ কথা ঠিক যে অবস্থার কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নের উন্নতির সঙ্গে প্রচুর হিংসা ও উৎসাদন জড়িত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বড় নেতারা নিজেরাই এ হিংসার সব চেয়ে বেশী নিন্দা করেছেন।

৬

পাশ্চাত্য রাষ্ট্র এবং কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ আজ আন্তর্জাতিক ব্যাপারে প্রধান হয়ে উঠেছে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। স্পষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই বিশাল রাষ্ট্রের মধ্যে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য বিদ্যমান। তারা উভয়েই শ্রমশৈল্পিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার এক উচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছে; তারা উভয়েই যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে এবং তার মানব সমস্যা সমাধান-ক্ষমতায় বিশ্বাসী। উভয় দেশের জনসাধারণই সহৃদয়, অতিথিবৎসল এবং শান্তিঅনুরাগী। আজকের আসল পার্থক্য উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে। শেষোক্ত দেশগুলির এই বোধ আজ হয়েছে যে একমাত্র বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশিল্পের উন্নয়ন দ্বারাই তাদের অগ্রগতি সম্ভব এবং তাদের দারুণ দুর্দশার অবসান সম্ভব। সেই উদ্দেশ্যে তারা কাজ করছে এবং তাদের চেষ্টা অল্পবিস্তর সফল হচ্ছে। বড় কঠিন এ কাজ। ইয়োরোপে সত্যকার রাজনৈতিক বিপ্লবের আগে একটা অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটেছিল। যখন রাজনৈতিক বিপ্লব এল তখন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে কিছু অনুকূল আবহাওয়া তৈরি হয়েই ছিল। এশিয়ায় রাজনৈতিক বিপ্লব এল প্রথমে এবং তার ঠিক পরেই সামাজিক সুখসুবিধার জন্য দাবী উঠল। কিন্তু অনগ্রসর অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যে এবং সংগতির অভাবে এ দাবী পূরণ করা সহজ ছিল না। যে সব দেশে আগে শ্রমশিল্প প্রসারলাভ করেছিল এবং যারা ব্যাপক উৎপাদনের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তাদের থেকে অনুন্নত দেশগুলির সমস্যা ছিল অন্যরকম। এ কথা স্পষ্ট যে ইয়োরোপ ও আমেরিকা যে দীর্ঘ প্রক্রিয়া দ্বারা শ্রমশিল্প বিস্তৃত করে, অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে তা অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। এক সামাজিক চাপ নিরন্তর সক্রিয় ছিল; তা রাজনৈতিক সংগঠনকে বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারত যদি না জনসাধারণকে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করার মতো কিছু দেওয়া হত। তা ছাড়া ছিল দ্রুত-বর্ধমান জনসংখ্যার চাপ। যা কিছু বাড়তি উৎপাদন হচ্ছিল তা এই দ্রুত-বর্ধমান জনসংখ্যা শূন্যে নিচ্ছিল, পরবর্তী অগ্রগতির জন্যে সঞ্চয় বা বিনিয়োগের বিশেষ কোনো উপায় আর থাকছিল না। সুতরাং মূল সমস্যা দাঁড়ায় এই : অনুন্নত ও দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে বিনিয়োগ এবং অধিকতর উৎপাদনের জন্যে উদ্বৃত্ত কি করে সৃষ্টি করা যায়? এ রকম যে কোনো চেষ্টার অর্থ জনগণের উপর আরও বোঝা

চাপানো। অথচ এই জনগণই দাবী করছিল তাদের বর্তমান বোঝা কমানো হোক।

বলপ্রয়োগের পন্থতি প্রয়োগ করা যেত। কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, জনগণের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগও বেশী দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না যদি না তা ভবিষ্যতের আশার সংগে যুক্ত হয়। সুতরাং মূলত দরকার কোনো ভাবে অধিকতর প্রয়াসের অনুপ্রেরণা দেওয়া এবং ভবিষ্যতের আশা জাগানোর মতো লক্ষ্য জনসাধারণের সামনে রাখা। সে ভবিষ্যৎ অতি দূরবর্তী হলেও চলে না। গণতান্ত্রিক সমাজে এই রকম আশা ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে এবং অবস্থার ক্রমোন্নতি সাধন করে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন, তার উপরই সব কিছু নির্ভর করে।

অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষই বোধ হয় অধিকাংশ দেশের চেয়ে অগ্রসর। গত কয়েক বছরের মধ্যে শ্রম-শিল্পের ভিত্তি স্থাপনে, কৃষির উন্নয়নে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও শিক্ষার প্রসারে সুস্পষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, ভারতবর্ষ তার সার্থক জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বারা সংগঠিত লক্ষ্য ও আদর্শ এবং শৃংখলার সুবিধা পেয়েছে।

জাতীয়তাবাদ এখনও এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ভাবধারা। জাতীয়তাবাদের প্রসার এশিয়ায় সুস্পষ্ট। ইয়োরোপেও তা ক্রমে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের সংগে যুক্ত সেই ভয়ংকর জাতীয়তাবাদ আমরা দেখেছি। সে বিপদ অবশ্য প্রতিহত হয়েছে কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনুগ্র ধরনের এক আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ এখনও অনেক দেশের নীতিকে প্রভাবিত করছে। ইয়োরোপের অনেক দেশেই তা অল্প বা বেশী পরিমাণে প্রতীয়মান। ইয়োরোপে এই প্রবণতার পাশাপাশি রয়েছে জাতি-অতিক্রমী ঐক্যের অভিমুখী এক প্রবণতা। একটি সাধারণ বাজার এবং বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠান সংগঠনের চেষ্টায় এর প্রকাশ।

এমন কি, কমিউনিস্ট দেশেও জাতীয়তাবাদ দেখা যাচ্ছে। মার্কস্‌বাদী চিন্তা এবং তার পরবর্তী বিভিন্ন রূপান্তর দ্বারা প্রভাবিত সোভিয়েট ইউনিয়নেও একটা শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী মনোভাব রয়েছে। পূর্ব-ইয়োরোপের অন্য দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের শক্তি প্রতীয়মান। এমন কি চীনেও সাম্যবাদ জাতীয়তাবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বলা যায়, সাম্যবাদ যেখানেই প্রবর্তিত হয়েছে সেখানেই তার শক্তির কারণ অংশত হল জাতীয়তাবাদের সংগে তার সংযোগ। অনুন্নত ও দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে বিদ্যমান অসন্তোষকে বাদ দিয়ে যেখানে এ দুই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, সেখানে সাম্যবাদ অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

যে সব দেশ এখনও বিদেশীর পদানত সেখানে জাতীয়তাবাদের প্রেরণাই স্বাধীনতা-সংগ্রামের আকার নিচ্ছে। বিরোধীভাব দ্বারা কিছুটা প্রতিহত হলেও স্বাধীন ও শক্তিশালী দেশে তা ক্ষমতা বিস্তারের দিকে ঝুঁকেছে।

৭

সুতরাং একদিকে বৃহত্তর সংহতির মনোভাব, যেমন ইয়োরোপে ও অন্যত্র, এবং অন্যদিকে প্রাচীন জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রাতিগ শক্তি—এই দুয়ের মধ্যে এক বিরোধ আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির এবং বিশেষভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরাট উন্নতি ক্রমশই বৃহত্তর সংহতির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। এবং এটা ধরে নেওয়া যায় যে, অন্যান্য ব্যাপারের মতো এই ব্যাপারেও আধুনিক জীবনের মূল বাস্তব সত্যের প্রতিভূ বিজ্ঞানই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে।

আসল বিপদ জাতীয়তাবাদী সংঘাতের দিক থেকে, কারণ তা মহাযুদ্ধ নিয়ে আসতে পারে।

আজকের পৃথিবীতে প্রধান দুই মতাদর্শের মধ্যে ঠাণ্ডা-লড়াইয়ের ফলে এ রকম সংঘাতের সম্ভাবনা বেড়েছে। কিন্তু এই তথাকথিত মতাদর্শের সংঘাতের পিছনে রয়েছে প্রধান জাতিগুলির রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাদের একে অন্যের সম্বন্ধে ভীত। কমিউনিস্ট এবং অ-কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীতে ও অর্থনৈতিক মতবাদে এবং রাষ্ট্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্রে মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য ইতিমধ্যে কিছু কমেছে এবং মনে হয় কমতেই থাকবে। উভয়ের মধ্যেকার ব্যবধান যতই গভীর ও বিস্তৃত হোক তা ক্রমেই হ্রাস পাবে। মানব-জীবনকে মতাদর্শ ততটা বদলাচ্ছে না কিন্তু বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির প্রসার সামাজিক ও অর্থনৈতিক গঠনকে অবিরামভাবে রূপান্তরিত করছে। কার্য গঠনকে প্রভাবিত করে স্থাপত্যে এটা সত্য। সমাজের গঠনেও শেষ পর্যন্ত এটা সমানভাবে সত্য। তার কাঠামো তার কার্যের অনুসারী। বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজি অবিরামভাবে কাজকে রূপান্তরিত করছে; সুতরাং সমাজের গঠনকেও এই সব নতুন কাজের ছাঁচের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে।

অতএব কোনো একটা বিশেষ মতাদর্শ নয় পরন্তু টেক্‌নলজি-সংক্রান্ত অগ্রগতিই হল আধুনিক জীবনের আসল ও বৈপ্লবিক ব্যাপার। টেক্‌নলজি-সংক্রান্ত পরিবর্তন যেখানে মন্থর সেখানে প্রাচীন গঠনগুলি বজায় আছে। অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ দেশে পশ্চাৎপদ গঠন ও সামাজিক কাঠামো টিঁকে থাকছে, যার ফলে সে আধুনিক বিজ্ঞানযুগের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য করতে পারছে না। কিন্তু জীবনের বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। পরিবর্তন আসবেই এবং তার সঙ্গে আসবে অন্যান্য পরিণাম। এই পরিবর্তন কখনো কখনো আকস্মিক ও বিপর্যয়কর হয়েছে; কিন্তু অন্যরকমেও আরও মন্থরভাবে এই সব পরিবর্তন আসে।

গণতান্ত্রিক সমাজে, অর্থাৎ যেখানে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার এবং কোনো ধরনের এক পার্লামেণ্টারী শাসন বিদ্যমান সেখানে কার্যের পরিবর্তন, এমন কি কতকাংশে গঠনের পরিবর্তন ঘটাবার উপায় উপস্থিত রয়েছে। কিন্তু প্রাচীন গঠন এবং কায়েমী স্বার্থ পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করে যতক্ষণ না অবস্থা গতিকে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। "প্রতিষ্ঠান" সর্বদাই যে কোনো পরিবর্তনের প্রতিরোধী, তা সে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক যাই হোক না কেন।

৮

বেঁচে থাকা হল পরিবর্তমান অবস্থার সঙ্গে ক্রমাগত খাপ খাইয়ে নেওয়া। প্রত্যেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক গঠনের একটা বিশেষ নিয়মানুবর্তিতা থাকে। ধর্মের নিয়মানুবর্তিতা আছে, সামাজিক প্রথায় আছে। একটা নৈতিক বা মানসিক নিয়মানুবর্তিতা এর অন্তর্গত। কার্য এবং গঠন যখন বদলায় তখন পুরনো নিয়মানুবর্তিতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমে তার জায়গায় নতুন নিয়মানুবর্তিতা বলবৎ হয়। গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে টেক্‌নলজি সংক্রান্ত পরিবর্তনের জন্যে সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে এবং সব সময়েই একটা অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রয়েছে। প্রাচীনকালে জীবন সরল ছিল এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার সংযোগ ছিল আরও বেশী। কাজেই চিন্তা ও ধ্যানের সময় ছিল। এখন জীবন ক্রমশই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। শান্ত চিন্তা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। অবকাশ যদি

মেলেও তবু সে অবকাশ নিয়ে আমরা কি করব জানি না।

অবকাশ ব্যবহারের এই সমস্যা উন্নত দেশগুলিতে ক্রমশই জটিল হয়ে দাঁড়াছে। অবশ্য ভারতবর্ষকে এ সমস্যা বর্তমানে স্পর্শ করছে না এবং অদূর ভবিষ্যতে করবেও না। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত এবং যান্ত্রিক উপায়ের উপর ক্রমশ বেশী নির্ভরশীল জীবন তার আস্বাদ হারিয়ে ফেলতে আরম্ভ করে, এমন কি কর্মবৃত্তির বোধও তার আর থাকে না। নৈতিক ও মানসিক নিয়মানুবর্তিতা নষ্ট হয় এবং এক ধরনের মোহভঙ্গ আসে যার জন্যে মনে হতে থাকে আমাদের সভ্যতায় কোনো গলদ দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ ফিরে যেতে বলেন প্রকৃতির কাছে, প্রাচীন কালের সরল জীবনে। কিন্তু সে জীবনের যে গুণই থাক না কেন, ফিরে যাওয়া আর চলে না, কারণ পৃথিবী বদলে গেছে। ব্যক্তি বিশেষ হয়তো সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করতে পারে, কিন্তু সমগ্রভাবে সমাজ তা পারে না। জীবনের সমস্ত সমস্যা ও বিঘ্নবিপদ সমেত তারই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সমাজকে যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করতে হয় তার, তা যদি সমাজ না করে তাহলে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।

বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির অগ্রগতির ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই সম্ভব, বিশেষত পৃথিবীর সর্বত্র সকলের জন্যে জীবনের মুখ্য প্রয়োজনগুলি পূরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব। এই অগ্রগতির কারণে উচ্চতর মান প্রবর্তনের এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানের পথ উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আজ কল্যাণ-রাষ্ট্র, এমন কি শ্রেণীহীন সমাজ শুধু সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ নয়, ধনতান্ত্রিক দেশগুলোও তা মেনে নিচ্ছে, যদিও অগ্রসর হবার পথ উভয়ের পৃথক। অতএব মূল আদর্শগুলি পরস্পরের কাছাকাছি আসছে, এবং এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে যে পদ্ধতি পৃথক হলেও ঐ সব লক্ষ্যের নিকটবর্তী হওয়া যাবে। এই পদ্ধতিগুলি শুধু যে যুক্তিসংগত তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে তা-ই নয়, তাদের নির্ভর করতে হবে দেশ বা জাতির ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির উপর। সত্যকার কোনো পরিবর্তন সহজে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তাকে উদ্গত হতে হয়। যে কোনো দেশের, বিশেষত যে দেশের সভ্যতা প্রাচীন তার শিকড় অতীতের গভীরে প্রসারিত; সে সব শিকড় উপড়ে ফেললে সমূহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী, অবশ্য পুরনো অনিষ্টকর আচার ও বিধি-বিধানরূপী অনেক আগাছাকে উপড়ে ফেলা যায় এবং ফেলা উচিত। প্রকৃতি যেমন এক ধরনের ভারসাম্য স্থাপন করে যা হঠাৎ পাল্টে দিলে কুফল দেখা দেয়, তেমনি কোনো সমাজের বা দেশের বেলায় প্রাচীন রীতিনীতি হঠাৎ ওলট-পালট করে দেওয়া সহজ নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। কোনো সমস্যাকে এই ভাবে সমাধান করবার চেষ্টা করলে গুরুতর ও কঠিনতর সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

আমরা যে বহির্জগতে বাস করি তার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য, আরও অনেক বেশী প্রযোজ্য মানুষের অন্তর্জীবনের ক্ষেত্রে। সকলে জানে, উপজাতীয় এবং কথঞ্চিৎ আদিম সমাজে দ্রুত পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে গিয়ে বিপর্যয়কর ফল ঘটেছে। অধিকতর উন্নত সমাজ দ্রুত পরিবর্তনে ততটা ক্ষতিগ্রস্ত না হতে পারে, কিন্তু "জেট"-এর যুগে এবং মহাকাশ ভ্রমণের আগামী যুগে কি কি জৈব ও অন্য পরিবর্তন ঘটবে কেউ জানে না।

বাইরের ক্ষেত্রে যদি এই হয়, তাহলে মনে ও আবেগে নিশ্চয়ই আরও বড় পরিবর্তন ঘটবে। মানুষকে আজ তার কর্মতৎপরতায় ও বিধিব্যবস্থায় পরিবর্তনকে চিরসঙ্গী করে বাস করতে হচ্ছে। মানব-ইতিহাসে এরকম কখনও হয়নি। বাস্তবিকপক্ষে, পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষ তাল রাখতে পারছে না, এবং যদিও বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির ফলকে যে কাজে

লাগাচ্ছে তবু তাদের কদাচিৎ বুঝতে পারছে। শিক্ষার দ্বারা এক পরিপূর্ণ মানুষের বিকাশ ঘটানো হবে এবং সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের ও যৌথ জীবনে অংশ গ্রহণের উপযোগী করে যুবকদের তৈরী করা হবে—শিক্ষার এই উদ্দেশ্য ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমাজই যখন প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে তখন কি ভাবে তৈরী করা হবে এবং কোন লক্ষ্য ঠিক করা হবে তা বোঝা মুশকিল। যান্ত্রিক সভ্যতা এবং সমাজ-জীবনের প্রাচীন গঠন ও তার দর্শন, এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব বিদ্যমান। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক বদলাচ্ছে, এমন কি নিজের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গেই সম্পর্ক বদলে যাচ্ছে। যান্ত্রিক সমাজে মানুষের ব্যক্তি-সত্তার মূল্য কমে যাচ্ছে। ব্যক্তি জনতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে; সমষ্টির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে নিরন্তর সচেষ্ট এক জটিল ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে সে নেহাৎ একটি যন্ত্রাংশে পরিণত হবার উপক্রম করছে।

আমরা অনেকেই ব্যক্তির বিকাশ ও স্বাধীনতার উপর প্রচুর মূল্য আরোপ করি। মতাদর্শগত পটভূমি এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে বা বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু ব্যক্তি-সত্তার মূল্য যার দ্বারা বোধ হয় সব চেয়ে বেশী হ্রাস পায় তা হল যন্ত্রীকরণ ও ইচ্ছা নিরপেক্ষ স্বয়ংক্রিয়া।

৯

আমরা টেক্‌নলজিগত এই সব দ্রুত পরিবর্তনের ফল দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে বর্তমানের যুবক যুবতীদের মধ্যে। পরিণত বয়সীদের সঙ্গে যুব সম্প্রদায়ের পার্থক্য দেখে পিতামাতা, শিক্ষক সমাজকর্মীরা ভাবিত। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা আচরণের যে ছক অনুসরণ করে এসেছে তা আর গ্রাহ্য হচ্ছে না। প্রাচীন নৈতিক মান বর্জিত হচ্ছে। চরম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অপরাধ, পানাসক্তি, ধ্বংসাত্মক কাজ, কামচর্চার দিকে প্রবণতা এবং এর সঙ্গে রয়েছে জীবন ও কর্মের প্রতি এক অবজ্ঞাসূচক ও নৈতিবাচক মনোভাব। যে জগতে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে এবং যেখানে কোনো আশ্বাস বা নিশ্চয়তা নেই, সে জগতে ইন্দ্রিয় সুখবাদী জীবন-নীতির আবেদন খুব প্রবল। ফলে জাতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বিপন্ন এবং সামাজিক ভাঙনের প্রবণতা প্রতীয়মান।

এটা হয়তো একটা চরম মত এবং বর্তমানের ঘটনার সঠিক পরিমাপ নয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এইসব প্রবণতা রয়েছে, বিশেষ করে সেই সব দেশে যে সব দেশ ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অনুন্নত দশের চেয়ে উন্নত এবং অগ্রসর। এ সম্বন্ধে খুব অবহিত হওয়া দরকার, কারণ এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে এই সব প্রবণতা আমাদের জীবনকেও প্রভাবিত করতে পারে। হয়তো এসব প্রবণতা দ্রুত রূপান্তরের যুগের অপরিহার্য পরিণাম। হয়তো টেক্‌নলজির সঙ্গে সমঞ্জস এক নতুন সভ্যতার ভিত্তি ক্রমে স্থাপিত হবে এবং তার সঙ্গে বিকশিত হবে নতুন মতাদর্শ, যৌথ জীবনের নতুন গঠন এবং বিস্তৃততর এক জীবন-দর্শন।

যা ঘটছে সে সম্বন্ধে এ অভিমত অত্যন্ত নিরাশাবাদী বলে মনে করা হবে কিনা আমি জানি না। ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমার নিজের প্রতিক্রিয়া নিরাশাবাদী নয়। একটা বিশ্বাস আমার মনকে ভবিষ্যতের আশায় পূর্ণ করে। এ বিশ্বাসের আমি ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে পারি না। প্রচুর সৌভাগ্য আমার জীবনকে বরাবর অভিষিক্ত করেছে বলেই হয়তো এমন হয়। আমার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য ভারতীয় জনসাধারণের স্নেহ। কিন্তু আমি যখন বিদেশে গেছি তখনও সর্বত্র জনসাধারণের কাছ থেকে বন্ধুত্ব

ও প্রাণস্পর্শী অভ্যর্থনা পেয়েছি। এইভাবে আমার হৃদয়ে আমার দেশের জনসাধারণের প্রতি এক গভীর ভালোবাসা ও বিশ্বাস এবং অন্যান্য দেশের জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি সৃষ্টি হয়েছে। আমি উপলব্ধি করেছি, মানুষ যা দেয় তা পায়। যদি কেউ ভালোবাসা দেয় তাহলে তা প্রচুর পরিমাণে ফিরে পায়; যদি ঘৃণা দেয় তাহলে ঘৃণাই ফিরে পায়। আমি দেখেছি এবং অনুভব করেছি, জনসাধারণ সর্বত্র শান্তি, সদিচ্ছা ও সহযোগিতার জন্যে ব্যাকুল। এই যদি সত্য হয় (আমি সত্য বলে মনে করি) তাহলে ঘটনাস্রোতকে সংঘাত থেকে সহযোগিতায়, যুদ্ধের চিন্তা থেকে শান্তির কাজে ঘুরিয়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হওয়া উচিত।

আমার মনে হয়, ভয়ই সম্ভবত সবচেয়ে বড় অমঙ্গল, কারণ ভয় থেকেই সংঘাত ও হিংসার জন্ম। হিংসা ভয়েরই প্রতিক্রিয়া, অসত্যও তা-ই। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বড় দান যা দেওয়া যায় তা হল 'অভয় দান'। যে ব্যক্তি ভয়মুক্ত সে সব কিছুকে ঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পারে এবং মনে ও কাজে একটা পূর্ণতা বজায় রাখতে পারে। আজ আমরা দেখছি ভয় পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করছে, এমন কি সব চেয়ে বড় সব চেয়ে শক্তিশালী জাতিগুলিকেও ভয় চেপে ধরছে। সম্পদ ও ক্ষমতা এই ভয়কে না কমিয়ে কার্যত আরও বাড়িয়ে তুলছে। সন্ন্যাসী ও অতিমানব ছাড়া কেউ সম্পূর্ণ ভয়হীন হতে পারে না। কিন্তু ভয়হীনতার আদর্শকে আমরা সামনে রাখতে পারি এবং তা সাধনের চেষ্টা করতে পারি। ভারতবর্ষে গান্ধীজীর সব চেয়ে বড় অবদান, তিনি আমাদের জনসাধারণের মধ্যে এই ভয়বোধকে কমিয়ে দিয়েছেন।

ভয়হীনতা থেকে আসে করুণা ও সহনশীলতা। আমরা যখন বুদ্ধের কথা ভাবি তখন তাঁর করুণা আমাদের অভিভূত করে; আমরা যখন অশোকের কথা ভাবি তখন তাঁর আশ্চর্য সহনশীলতা সংকীর্ণ বিশ্বাস থেকে আমাদের টেনে তোলে।

সংঘাতে পৃথিবী পূর্ণ—দেশীয়, অন্তর্দেশীয়, জাতি বর্ণ ধর্ম ও শ্রেণীর সংঘাতে। এ সংঘাতকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা হাস্যকর; কিন্তু আমরা সংঘাতের পরিবর্তে শান্তির পথে তাদের সমাধানে অগ্রসর হতে পারি।

১০

আন্তর্জাতিক দিক থেকে বিশ্বশান্তি আজকের সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। যে সব বিরাট সমস্যা ও বিরোধে আমরা জর্জর তাদের সমাধান-চেষ্টা এর বিষয়। কি করে সমাধান আসবে তার নির্দেশ আমি দিতে পারি না। তবে আমার মনে হয়, সমাধানের উদ্দেশ্যে আমরা কোন উপায় অবলম্বন করব এবং কোন পথে চলব সে সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, দুটি জিনিসের মধ্যে একটিকে আজ আমাদের বেছে নিতে হবে—একদিকে যুদ্ধ, যার ফলে প্রায় পূর্ণ ধ্বংস এবং অন্যদিকে ঐ সব সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা। এই দুইয়ের মধ্যে যদি নির্বাচন করতে হয় তাহলে কোনটিকে নির্বাচন করা উচিত তা পরিষ্কার। এই নির্বাচনের পরবর্তী কাজ হল বিশ্বের উত্তেজনা যা কিছুতে বাড়তে পারে তা পরিহার করা। যুদ্ধকে আজ বাতিল করে দেওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত আমাদের গ্রহণ করতে হবে, কারণ যুদ্ধ দ্বারা জয় বা জয়ের কোনো ফললাভের সম্ভাবনা নেই। অতএব সর্বদা যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেখিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার "উপক্রম নীতি" অনুসরণ করলে

বুঝতে হবে বিজ্ঞতা লোপ পেয়েছে। অন্যের সঙ্গে যদি মতভেদ ঘটেও তবু রুদ্ধ সমালোচনা ও নিন্দা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে; আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, কোনো একটা গোষ্ঠীর পক্ষে অর্ধেক পৃথিবীকে মন্দ বলা বা মন্দের করায়ত্ত বলা হাস্যকর। ধনতন্ত্রী বা সাম্যবাদী-জগতের সমালোচনা করা সহজ; কিন্তু উভয়েরই মহৎ সব গুণ আছে, অনেক দোষ-ত্রুটি যদি থেকে থাকে তবুও; ভিতরকার বিরোধ সত্ত্বেও উভয়ে একই দিকে অগ্রসর হতে সচেষ্ট, এবং উভয়েই বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির অগ্রগতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের একমাত্র পথ হল বাস্তব পৃথিবীকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করা এবং পরস্পরের প্রতি আরও সহনশীল হওয়া। পরস্পর-বিরোধী ধর্মের প্রাচীন সংঘর্ষ রক্তাক্ত যুদ্ধ বিগ্রহের পর ক্রমে শেষ হয় এবং নতুন এক সহনশীলতা গড়ে ওঠে। প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতবাদের মধ্যেও সহনশীলতা গড়ে না উঠবার কোনো কারণ নেই। শেষ পর্যন্ত জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর দ্বারাই উভয়ে প্রভাবিত হবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। প্রত্যেক দেশেরই নিজের ভাবে নিজেকে গড়ে তুলবার স্বাধীনতা থাকা উচিত। অন্যদের কাছ থেকে সে শিখবে, কিন্তু অন্যেরা তার উপর কিছু চাপিয়ে দেবে না। এইভাবে প্রত্যেক মতাদর্শ অন্যকে প্রভাবিত করবে এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হবে।

জাতীয়তাবাদ একটা জাতির পক্ষে সুস্থতারই পরিচায়ক, সুতরাং বাঞ্ছনীয়; দমিত হলে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হলে তা আক্রমণাত্মক ও রণলিপ্সু হয়ে ওঠে। আধুনিক জাতীয়তাবাদ বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও জাতিবাদেরই প্রতিক্রিয়া।

জাতিবাদ এখনও বিভিন্ন পরিমাণে বহু দেশে বিদ্যমান। কিন্তু সাধারণভাবে তা নিন্দিত। একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন রাষ্ট্র তাকে নিজের দর্শনরূপে গ্রহণ করেছে। এ যে সংঘাতের এক সাংঘাতিক উৎস তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান। যেহেতু নিকৃষ্টতম আধিপত্য এর সারবস্তু সেই হেতু তিক্ততা ও তীব্র প্রতিক্রিয়া এ থেকে সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ বিরোধের সমাধান হিংসার পদ্ধতির উপর ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হতাশাকেই মেনে নেওয়া, তা ছাড়া হিংসার বিপর্যয়কর পরিণাম তো আছেই। এ সম্ভাবনা অবশ্য রয়েছে যে, বিশ্বমত জাতি-বাদের বিরুদ্ধে এমন কঠোর হয়ে উঠবে যে, কোনো দেশ বা গোষ্ঠী তা সমর্থন বা গ্রহণ করতে পারবে না।

যে রূপেই নিক না কেন, সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ আজ পৃথিবীর অবস্থার সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং তা সংঘাতের এক উৎস। এখনও অনেক জায়গায় এর অস্তিত্ব রয়েছে এবং এর দর্শন অনেকের মনকেই প্রভাবিত করছে। কিন্তু বর্তমানে তা এক নিন্দিত মতবাদ এবং সর্বত্রই তা আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত। অতএব বিশ্বনীতি বলতে বোঝায় সেই নীতি যা জাতিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাবে এবং সব দেশকে তাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে। কোনো কোনো দেশে হয়তো এর ফলে বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে; কিন্তু তা সীমাবদ্ধ থাকবে, বৃহত্তর অঞ্চলকে স্পর্শ করবে না এবং অল্পদিন পরে নিজের থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। এক দেশের পক্ষে অন্য দেশের উপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অন্যায়। তারই গতি আজ বিপজ্জনক পরিণামের দিকে।

অতীতে সামরিক জোট বা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যে যৌক্তিকতাই থাকুক না কেন, আজ তা যুদ্ধের আশঙ্কা ও নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি করছে। এই জোট আর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের জন্যে সব দেশের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ব্যাহত হয় এবং পৃথিবীর আবহাওয়া দূষিত হয়। যতদিন

ঠাণ্ডা লড়াই থাকবে ততদিন সহনশীলতা থাকবে না। অনুন্নত দেশগুলিকে অগ্রসর হতে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করার বদলে সামরিক বিবেচনাই এদের আসল হয়ে ওঠে এবং প্রতিক্রিয়াশীল ও জনসাধারণের বিরাগভাজন রাজনৈতিক শাসনচক্রকে প্রায়ই সমর্থন দেওয়া হয়। তার ফলে নিরাপত্তা আরও বিঘ্নিত হয়।

পৃথিবীর দুঃখ দুর্দশা, বিরোধ ও বিক্ষোভ কোনো মন্ত্রবলে বা সাধুবাক্যে অপসৃত করা যাবে, এ কথা বলা অবাস্তব। কিন্তু যার দ্বারা উত্তেজনা প্রশমিত হতে পারে এবং অবশেষে সংঘাতের সম্ভাবনা দূর হতে পারে, এমন কার্যক্রমের প্রস্তাব করা বাস্তব। মূলত এই কার্যক্রম হল এক নতুন মনোভঙ্গী, যার পিছনে পিছনে আসবে সমধারার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি। বহু আলোচিত পঞ্চশীল বা পঞ্চসূত্র সেই মনোভঙ্গীকেই উপস্থিত করেছে। কিন্তু তা শুধু বাস্তব হতে পারে যদি মন ও হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে, অর্থ-হারানো শব্দ সমষ্টি খালি প্রচার করলেই হবে না। যুদ্ধ থেকে শারীরিক প্রতিনিবৃত্তিই শান্তি নয়, শান্তি হল সমগ্র বিশ্বে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

১১

ভারতবর্ষে আমরা এই নীতি আন্তর্জাতিক ব্যাপারে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। অবশ্য তাতে যে আমরা সব সময়েই সফলকাম হয়েছি তা বলতে পারি না। বৈদেশিক নীতি শেষ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও উন্নতির উপর নির্ভর করে। অতএব বিশ্ব ব্যাপারে যদি আমাদের কোনো কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় তাহলে আমাদের পক্ষে আভ্যন্তরীণ অগ্রগতি একান্ত আবশ্যক। আমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যে অবশ্য তা আরও বেশী আবশ্যক।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার দুই বছর শেষ হবার পর নানা দিকে আমাদের নিশ্চিত অগ্রগতি হয়েছে। কোনো কোনো দিকে তা সুস্পষ্ট, কোনো কোনো দিকে তা ততটা স্পষ্ট নয়। যত দ্রুত অগ্রগতি হলে আমরা খুশী হতাম, তত দ্রুত কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয় নি; কিন্তু এ কথা যেন স্মরণ রাখি যে অগ্রগতি যা হয়েছে তার পরিমাণ অল্প নয়। কৃষি ও শ্রমশিল্প, উভয় ক্ষেত্রেই এই অগ্রগতি স্পষ্ট, আর শেষ পর্যন্ত এর উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে।

এই অগ্রগতির বনিয়াদ হল শিক্ষা। এখন বনিয়াদী শিক্ষা এবং টেক্‌নলজি-শিক্ষা, দুয়ের প্রতিই প্রচুর মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে স্কুলে ও কলেজে পড়ছে, হাজার-হাজার ছেলেমেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও যন্ত্রশিল্প-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করছে। এ সংখ্যা ভারতবর্ষের জনসংখ্যার একটা অংশমাত্র, করবার অনেক কিছুই বাকী রয়েছে। তবু এ সংখ্যা বৃহৎ। এরা স্কুল কলেজ থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন নিয়ে আসে জীবন নির্বাহের ব্যাপারে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। সুতরাং মন্থর কিন্তু অনিবার্যভাবে আমাদের সামাজিক ছাঁচ বদলে যাচ্ছে। সব চেয়ে বড় এবং বোধ হয় সব চেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের দ্বারা। এই সব বালিকা এবং যুবতীরাই ভারতবাসীর সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করছে এবং তাকে ক্রমশ বেশী পরিমাণে বদলে দেবে। বর্তমানে এই সব পরিবর্তন গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরে ও নগরেই ঘটছে বেশী। কিন্তু আমাদের গ্রামকেও তা স্পর্শ করছে এবং আর কয়েক বছরের মধ্যে স্কুলে পড়ার বয়সের সব ছেলেমেয়েই বনিয়াদী শিক্ষা লাভ করবে।

আধুনিক শিক্ষার সমালোচনা করে অনেক কথাই বলা হয়েছে। আমরা প্রায় সকলেই তার কোনো না কোনো দিকের সমালোচনা করেছি। তবু এই সত্যটা থেকে যায় যে শিক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এবং আমাদের জীবন-বিন্যাসকে বদলে দিচ্ছে।

জনসংখ্যা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা পৃথিবীতে জনসংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গেছে এবং এই বৃদ্ধির হার যদি বজায় থাকে তাহলে মনে হয় এই শতাব্দীর শেষাশেষি পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৩৫০ কোটি থেকে ৫০০ কোটির মধ্যে। ভারতবর্ষে ২০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৬০ কোটি থেকে ৬৮ কোটি। আমরা যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খানিকটা রোধ করতে সমর্থ হই তাহলে ৬০ কোটি হল প্রত্যাশিত সর্বনিম্ন সংখ্যা।

জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির দুটো দিক আছে। যে দিকটা নিয়ে আমাদের সব চেয়ে বেশী উৎকণ্ঠা তা হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক এবং যত অগ্রগতিই আমরা অন্যদিকে করি না কেন এই বৃদ্ধি আমাদের জীবনযাত্রার মান নীচুর দিকে টেনে রাখবে। আর একটা দিক হল, বিশ্ব জনসংখ্যার এই বিপুল বৃদ্ধি বিশ্বের সমস্ত সম্পত্তি ও শ্রমশিল্প-উপকরণ দ্রুত উজাড় করে দিচ্ছে। এ বিষয়ে সারা দুনিয়া যদি আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো চলে তাহলে বোধ হয় এই শতাব্দীর শেষাশেষি পৃথিবীর সমস্ত আবশ্যকীয় উপকরণ শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য সে সম্ভাবনা কম। কিন্তু অন্যান্য দেশে দ্রব্য ব্যবহারের হার যদি অনেক কমও হয় তাহলেও আজ যে সব উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে তা আর কয়েক শ বছরের বেশী থাকবে না।

সুতরাং এর দুটো পরিণাম দাঁড়াচ্ছে। একটা হল, জনবৃদ্ধির হার আমাদের রোধ করতে হবে; এবং অন্যটা হল, শক্তির অন্যান্য উৎস এবং উপকরণ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। ভারতবর্ষে আমরা আমাদের স্বার্থের জন্যেই জনবৃদ্ধি-প্রতিরোধে উদগ্রীব। ব্যাপারটা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, জরুরীও।

১২

দুটো মূল সত্য আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রথম, বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির উন্নতির ফলে কতকগুলি জাতির উৎপাদন ক্ষমতা এবং সম্পদ ও শক্তির বিপুল বৃদ্ধি। দ্বিতীয়, এই সব সম্পদশালী ও শক্তিশালী জাতির সঙ্গে অনুন্নত জাতিগুলির বিরাট প্রভেদ। এই প্রভেদ বেড়েই চলেছে এবং বস্তুত সাম্প্রতিককালে অনুন্নত দেশে জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধির চেষ্টা সত্ত্বেও এ পার্থক্য কমেনি। যদি স্বাভাবিক অর্থনৈতিক শক্তির এবং অন্যান্য শক্তির ক্রিয়া অবাধে চলতে দেওয়া হয় তাহলে ধনী-জাতিগুলি আরও ধনী ও আরও ক্ষমতাশালী হবে এবং অন্যেরা নিছক প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই প্রাণপাত করতে থাকবে। যাদের আছে তারা আরও পাবে। এমন কি এক দেশের মধ্যেই দেখা যায় উন্নততর অঞ্চলগুলি অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে আরও এগিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

এর ফলে জাতিতে জাতিতে সংঘাত ও যুদ্ধের বিপদ দেখা দেয় এবং অনুন্নত দেশে সমাজ-বিক্ষোভ বাড়ে। একদিকে ক্ষমতা ও সম্পদ থেকে আসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাত; অন্যদিকে দারিদ্র্য ও দুর্দশা সৃষ্টি করে সংঘাত ও বিপর্যয়। দুইয়েরই পরিণাম দাঁড়ায় ভয় এবং নিরাপত্তার অভাব। সম্পদ ও ক্ষমতা অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হলে নিরাপত্তা আসে না

এবং পৃথিবীতে যে সব শক্তি ক্রিয়াশীল রয়েছে তাদের ঠিকমতো বোঝবার সুযোগও পাওয়া যায় না। অতএব জাতিতে জাতিতে হোক বা একই জাতির মধ্যে হোক, এইসব প্রভেদ ও অসাম্য হ্রাস পাওয়া দরকার।

পারমাণবিক যুগের সমস্যা বিগতকালের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। কি রাজনীতিতে কি অর্থনীতিতে কোথাও এই সব সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সন্তোষ-জনক ফল পাওয়া যায় না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভয় ও ঘৃণার সমস্ত উপচার নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াই চালানোর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখছি যে এ থেকে মানুষের বিপদই বাড়ে, কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। দেখছি, পারমাণবিক বিস্ফোরণের যখন পরীক্ষা চালানো হচ্ছে তখনই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এ রকম প্রত্যেকটি পরীক্ষা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। নৈতিক বিবেচনার কথা যদি নাও ধরা হয় তা হলেও এই সব নীতির কিছুমাত্র যৌক্তিকতা নেই। তবু কেন এই সব সেকেলে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে? আমরা আশা করব, সব রকম পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা বন্ধ করার জন্যে এবং অস্ত্রসজ্জা ক্রমে হ্রাস করতে অবিলম্বে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এক পক্ষীয় ব্যবস্থা-অবলম্বনের ভয়ে হয়ত এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না, কিন্তু দু'পক্ষেরই যুক্তি এবং বিচার এ-ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করা উচিত; তাতে সব দেশেরই লাভ।

এই একই যুক্তি অর্থনৈতিক মতামত ও উপায়-চিন্তা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। যে জগতে ব্যাপক দারিদ্র্য এবং তার পাশাপাশি মাত্র কয়েকটি ঐশ্বর্যশালী ভাগ্যবান দেশ বিদ্যমান, সে জগতের অন্তর্নিহিত বিপদ যে কত বড় তা উপলব্ধি করা হচ্ছে না। অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যদি আশু প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে ধনী দেশগুলির পক্ষে আপন স্বার্থের দিক থেকেই সে প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা সমান প্রয়োজন। এসব সমস্যা এক নতুন জগতের; পুরনো জগতের পদ্ধতি দিয়ে তার সমাধান সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে সমাজ-প্রগতির ক্ষতি করে অস্ত্রসজ্জার জন্যে বিপুল অর্থব্যয় করা হচ্ছে, এ এক মর্মন্তুদ ঘটনা। পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথ যখন খোলা রয়েছে তখন ভয় ও যুক্তিহীনতার আবহাওয়া যে বজায় থাকছে, তা আরও মর্মন্তুদ। সামরিক উপায় দ্বারা বোঝাপড়া আসতে পারে না, তাতে শুধু ভয় আর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আমি কোনো বিশেষ দেশকে দোষ দিচ্ছি না, কারণ সব দেশই কম বেশী এই ভয়ের আবহাওয়ার কবলে, এবং তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে তারা অসমর্থ। এখন আমাদের কর্তব্য অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই আবহাওয়া বদলাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

ধনতন্ত্রের প্রথম যুগে সব চেয়ে বেশী জোর দেওয়া হত উৎপাদনের উপর (বস্তুত এখনও যথেষ্ট দেওয়া হয়)। তখন তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ক্রমেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল যে নিছক উৎপাদনেই আমাদের সমস্যার সমাধান হয় না কিম্বা সুখ ও তৃপ্তি আসে না। সম্পদ, সম্পত্তি এবং আরও বেশী অর্থের জন্যে তৃষ্ণা মানুষকে ক্রমে দূষিত করে এবং ঈর্ষা ও বিরোধ সৃষ্টি করে। যদি কোনো মানব-গোষ্ঠীতে বা সমগ্র পৃথিবীতে সামাজিক সমতা বিধান লক্ষ্য হয় তাহলে নিছক উৎপাদন দ্বারা তা সাধিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তা অধিকতর বৈষম্য সৃষ্টির দিকেই ঝোঁকে। এই কারণে ন্যায়সঙ্গত ধন বণ্টন এবং উৎপন্ন বস্তুর যথোচিত ব্যবহারের সমস্যাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। মূলত কি ভাবে জীবন কাটাবো এবং কি ভাবে নিজের ও সকলের জীবনকে সার্থক করব, সেই জ্ঞান অর্জনই মূল প্রয়োজন। অর্থনৈতিক নীতিকে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা নৈতিক প্রশ্ন থেকে

বিচ্ছিন্ন করে প্রকৃতির নিয়ম ব্যাখ্যার মতো আর দেখা চলে না।

১৩

বারবার আমি যে এই বৃহত্তর প্রশ্নগুলির উল্লেখ করলাম তার কারণ এগুলিকে আমরা এড়াতে পারি না। আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যার উপর এগুলির প্রভাব রয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংস্কারের সঙ্গে আমরা এমন আবদ্ধ যে আমাদের সমস্যাগুলিকে বর্তমান পটভূমিতে বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে। দারিদ্র্য এক অধঃপতন, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা স্বাভাবিক। দারিদ্র্যের মধ্যে স্বাধীনতার কথা বলা প্রায় পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার। সবচেয়ে মর্মান্তিক দারিদ্র্যের স্থায়ী হবার উপক্রম। আবার অন্যদিকে আজ দেখা যাচ্ছে, মাত্রাতিরিক্ত ধনসমৃদ্ধি; তা ব্যক্তিতেই হোক বা সমাজেই হোক, বহু অমঙ্গলের জন্ম দেয়। নিছক বৈষয়িক সম্পদের ক্রমাগত সত্‌পীকরণ মানুষের অন্তর্জীবনে শূন্যতা নিয়ে আসতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক মনোভাব ও উপায়চিন্তা নিঃসন্দেহে অর্থনীতিমূলক, কিন্তু উপরের বিষয়গুলিও তার বিবেচনা থেকে বাদ পড়ে না। তবু বিপদ থেকে যায় যে সমাজতন্ত্রবাদ সমৃদ্ধি, এমন কি ন্যায়সঙ্গত বণ্টন ব্যবস্থা স্থাপনে অগ্রসর হওয়ার পথে জীবনের কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে হয়তো ধরতে পারবে না। এই কারণেই ব্যক্তির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে আজ আমাদের সমস্যা বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার উচ্চতর মান প্রবর্তনের সমস্যা। ভেবে চিন্তেই সমাজের সমাজতান্ত্রিক গঠনকে আমাদের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছি, যদিও তার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আমরা দিই নি। আমি মনে করি, এ সব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়, কারণ তা যুক্তি নিরপেক্ষ অন্ড় মত ও শ্লোগানে পরিণত হতে চায়। সেটা এই দ্রুত পরিবর্তমান জগতে পরিষ্কার চিন্তার পরিপন্থী। কিন্তু খুব বেশী অস্পষ্টতাও ফলপ্রদ কার্যের পরিপন্থী। অতএব নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা দরকার এবং সেই লক্ষ্যে কি ভাবে পৌঁছনো যাবে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আমি আগেই বলেছি, প্রত্যেক দেশের পক্ষে বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের উন্নতির পথে চলা আবশ্যক। সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণীয় হতে পারে, কিন্তু কোনো কিছু বাইরে থেকে চাপানো হলে সুস্থ সমৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং বিরোধের সৃষ্টি হয়। অতএব প্রত্যেক দেশকে তার নিজস্ব নীতি প্রবর্তন করতে দেওয়া উচিত, যদি না তা অন্য দেশের ক্ষতি না করে। এ কথা মানতে হবে আমরা কেউই সত্যের একচেটিয়া মালিক নই এবং আমাদের পক্ষে যা উপযোগী তা ভিন্ন অবস্থায় অন্যের পক্ষে উপযোগী নাও হতে পারে। আমাদের এও মেনে নেওয়া দরকার যে পৃথিবীতে যা আমরা পছন্দ করি না এমন অনেক জিনিসের সঙ্গেই আমাদের বাস করতে হবে, এবং একমাত্র যে প্রভাব প্রয়োগ করা উচিত তা হল আমাদের আচরণ ও নীতির প্রভাব, অন্যদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার প্রভাব। প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শের মধ্যে আজ বিরাট বিভেদ থাকা সত্ত্বেও আমি মনে করি সাদৃশ্যের ক্ষেত্র বাড়ছে এবং বাস্তব অবস্থা তাদের পরস্পরকে কাছে নিয়ে আসছে। যদি ভয় সেখানে না থাকে এবং হুমকি ও জবরদস্তি প্রয়োগ না করা হয় তাহলে এই কাছে

আসাটা ত্বরান্বিত হবে। মোটামুটি বলতে গেলে এর অর্থ এই যে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক জাতি ও অন্য জাতির মধ্যে স্থিতাবস্থা মেনে নিতে হবে। যে সব সমস্যা সমাধান আবশ্যক, শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

একটা জাতির ভিতরেও বিরোধ আছে। তবে পার্থক্যও আছে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সম্বলিত গণতান্ত্রিক সংগঠনে ঐ সব বিরোধ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাধান করা যায়। সাধারণতঃ ধর্মীয় বিরোধ এখন ঘটে না। জাতিতে জাতিতে বিরোধ পৃথিবীর অল্প কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, যদিও জাতিসমস্যা টিকে রয়েছে। প্রাদেশিক ও ভাষার ভিত্তিতে বিরোধের শোচনীয় দৃশ্য ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি। তবে, সমস্যার উদ্ভব আজ প্রধানত শ্রেণী-স্বার্থের সংঘাত থেকে এবং এই সব ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থকে হটানো সহজ নয়। তবু আমরা দেখেছি, ভারতবর্ষে বহুকালের রাজন্য, জায়গীরদার, তালুকদার ও জমিদারদের মতো কায়েমী স্বার্থের সমাধান শান্তিপূর্ণ পন্থাতিতেই করা হয়েছে। এর দ্বারা সুবিধা-ভোগী স্বল্প সংখ্যার অনুকূল এক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা উচ্ছেদ ঘটানো হয়। শ্রেণী-বিরোধ যে আছে সে কথা আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করব; কিন্তু এই রকম শান্তিপূর্ণ উপায়ে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন না করার কোনো কারণ নেই। এই সব পন্থতি সফল হবে একমাত্র যদি ঠিক লক্ষ্য আমরা সামনে রাখি এবং জনসাধারণ সে লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে বোঝে।

১৪

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, আহরণশীল সমাজ ধনতন্ত্রের ভিত্তি, কিন্তু এখন তা আর বর্তমান যুগের উপযোগী নয়। আগেকার কালে হয়তো উপযোগী ছিল। নিঃসন্দেহে ধনতন্ত্র অনেক বড় কাজ করেছে, কিন্তু আজকের পৃথিবী সে অধ্যায়কে অতিক্রম করে গেছে। আজকের পৃথিবী অত্যন্ত জটিল ও জনাকীর্ণ। আমরা পরস্পরের প্রায় দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট। এমন এক উন্নতস্তর ব্যবস্থা আমাদের সংগঠন করতে হবে যা আধুনিক অবস্থা ও মানসের সঙ্গে অধিকতর সমঞ্জস এবং যে ব্যবস্থার মধ্যে এত বেশী প্রতিযোগিতা থাকবে না, থাকবে অনেক বেশী সহযোগিতা। এ থেকেই আসবে বিশ্বরাষ্ট্র এবং তা শুধু সম্ভব এক স্বাধীন আবহাওয়ায় যখন প্রত্যেকটি জাতীয় গোষ্ঠী অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের ধ্যানধারণা অনুসারে অগ্রসর হবে।

দেখা যাচ্ছে, মুনাফা-প্রেরণার উপর প্রতিষ্ঠিত আহরণশীল সমাজ এই নতুন জগতের উপযোগী নয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কোনো উদ্যম বা অনুপ্রেরণা আর থাকবে না। অনুপ্রেরণা সব সময়েই দরকার হবে, তবে আর্থিক লাভে সীমাবদ্ধ না হতে পারে। জীবনকে বিচিত্রভাবে পেতে হলে আমাদের দুঃসাহসী হতে হবে, অনুসন্ধিৎসু হতে হবে এবং বিপদ এড়িয়ে চলবার মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তখনও বিস্তৃত থাকবে, কিন্তু আহরণের প্রবৃত্তি না নিয়ে তাকে নিছক অন্যভাবে কাজ করতে হবে। ভারতবর্ষে আমরা বেশ দেরীতেই শিল্প-বিপ্লবের অধ্যায়ে পা ফেলেছি। পা ফেলেছি এমন সময়ে যখন পৃথিবীর কোনো কোনো অংশ জেট ও পরমাণুর যুগে পৌঁচেছে। সুতরাং আমাদের একই সময়ে এই দুই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হবে এবং এ কাজ সহজসাধ্য নয়। সমাজতন্ত্রবাদকে যে আমাদের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছি তার কারণ শুধু এই নয় যে আমরা তাকে ঠিক ও কল্যাণকর বলে মনে করি, তার কারণ আমাদের অর্থনৈতিক

সমস্যা সমাধানের আর অন্য কোনো পথ নেই। মাঝে মাঝে এমন কথা বলা হয় যে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দ্রুত অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং হুকুমশাহী এবং জবরদস্তির পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এ কথা আমি মানি না। বস্তুত আজ ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বর্জনের যে কোনো চেষ্টা বিশৃঙ্খলা ডেকে আনবে এবং অগ্রগতির সমস্ত আশু সম্ভাবনাকে নষ্ট করবে। দূর ভবিষ্যতের দিক থেকেও আমি ব্যক্তির মর্যাদায় এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, যদিও জটিল সমাজে এ স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়, পাছে তা অন্যের অনিষ্ট করে।

যে বিরাট কাজ আমরা হাতে নিয়েছি তার জন্যে প্রয়োজন দেশের জনগণের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা। এ সহযোগিতা পেতে হলে তাদের সামনে এমন লক্ষ্য ধরতে হবে যা তারা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে এবং যা তাদের কাছ থেকে ফলপ্রদ মনে হয়। যে পরিবর্তন আমরা চাইছি তা ঘটাতে হলে আমাদের জনসাধারণের উপর ভার না চেপে পারে না, এমন কি ভার বহনের ক্ষমতা যাদের সব চেয়ে কম তাদের উপরও। যদি তারা উপলব্ধি না করে যে এমন এক সমাজ গড়ে তুলবার কাজে তারা অংশীদার যে সমাজ তাদের উপকার করবে তাহলে এই ভার তারা গ্রহণ করবে না কিংবা তাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। যাকে বলা হয় "নির্বাধ উদ্যোগ" (free enterprise) তা আমাদের জনগণকে কখনও আকৃষ্ট করবে না; তাতে আমাদের শক্তি ও সংগতি অনেক সময় এমন সব উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে যার গুরুত্ব অনেক কম। তার অর্থ হবে মুনাফা প্রবৃত্তিকে কাজে লাগানো। তাতে হয়তো ব্যক্তির স্বার্থ থাকতে পারে, কিন্তু সমাজের নয়।

আজকের পৃথিবীতে সব চেয়ে শক্তিশালী প্রেরণা হল সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যবোধ। পুরনো সামন্ত-ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল জমির উপর অল্পসংখ্যের মালিকানা এবং অন্যদের কোনো রকমে বেঁচে থাকা। আজ সে ব্যবস্থা কেউ সমর্থন করে না। সেই রকম প্রচলিত অনেক ব্যবস্থারই এখন আর কোনো প্রভাব নেই; সেগুলি হয় জনসাধারণের চিন্তার সঙ্গে, নয় বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে খাপ খায় না।

১৫

যে ধরনের কাজ আমাদের সামনে, তাতে সুপরিকল্পিত ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অগ্রসর হওয়া একান্ত প্রয়োজন, যাতে আমাদের সংগতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারি এবং জাতির কর্ম-প্রচেষ্টাকে আমাদের লক্ষ্যের দিকে চালিত করতে পারি। আশ্চর্যের ব্যাপার এই বিজ্ঞানের যুগে এখনও মুনাফাশিকারী এমন কিছু লোক রয়েছে যারা ব্যক্তিগত কারবারের এলোমেলো পদ্ধতিতে বিশ্বাসী।

আমরা আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মাঝামাঝি এসে গেছি। আমাদের সামনে রয়েছে তৃতীয় পরিকল্পনা। এমন এক পর্যায়ে আমরা পৌঁচেছি যেখানে এই পরিকল্পনাই পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট করে দেবে কোন কোন বাস্তব লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছতে হবে এবং কি উপায়ে আমরা পৌঁছব। পার্লামেণ্টে আমাদের রাষ্ট্রপতির ভাষণের পুনরুক্তি করে বলতে হয় যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষাশেষি "আমাদের মূল শ্রমশিল্প, কৃষি-উৎপাদন এবং পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির এক দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং তার দ্বারা আমরা আত্মনির্ভর ও সৃজনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পৌঁছব।" তৃতীয় পরিকল্পনা

শেষ হওয়ার সঙ্গেই আমাদের সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এ প্রত্যাশা আমরা করি না, তার পরেও অনেক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আসবে; কিন্তু আমাদের নিশ্চিত লক্ষ্য দারিদ্র্যের প্রাকার চূর্ণ করা, যাতে আমাদের অনুন্নত অবস্থা চিরস্থায়ী না হতে পারে। যদি তাতে আমরা কৃতকার্য হই—আমি বিশ্বাস করি হব—তাহলে আমরা আরও দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে যাব এবং অন্যের উপর আরও কম নির্ভর করব। এর জন্যে ভারী বোঝা আমাদের কাঁধে চাপবে। কিন্তু যদি আমরা সত্যই আমাদের লক্ষ্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে কৃতসংকল্প হয়ে থাকি তা হলে এ বোঝা এড়ানো সম্ভব নয়।

গত কয়েক মাসের মধ্যে জমি সম্পর্কে কতকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যার জন্যে কিছু কিছু সমালোচনা হচ্ছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই শ্রেণীবিরোধ। যে কোনো বড় সামাজিক পরিবর্তনের সময়ে এ বিরোধ অনিবার্য। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, শান্তিপূর্ণভাবে এবং সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে এ বিরোধেরও মীমাংসা আমরা করব, যেমন ইতিপূর্বে এ ধরনের অন্য বিরোধের ক্ষেত্রে করেছি।

আমি নিঃসন্দেহ যে, আমাদের পল্লীবাসীদের পক্ষে সমবায় ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। তাদের জন্যে বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠান একান্ত আবশ্যক এবং এগুলির শেষ পর্যন্ত সমবায় কৃষি-সংস্থায় পরিণত হওয়া উচিত। বর্তমান অবস্থায় যৌথ কৃষি সংস্থা ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী বলে আমি মনে করি না এবং আমি চাই না, আমাদের কৃষকরা একটা যন্ত্রের অংশ হয়ে একাকার হয়ে যাক। আমাদের মনে রাখতে হবে এ দেশের লোক-সংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং তুলনায় জমির পরিমাণ অতি অল্প। এই সব প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক যে উঠেছে শুধু এ থেকেই বোঝা যায় যে অগ্রগতি হচ্ছে এবং অর্থনীতির ব্যাপারে আমরা যুগ যুগান্তের সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসছি।

কোনো তত্ত্ব খাড়া, তা সে যত ভালোই হোক, আমরা আমাদের কৃষিজীবী জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করতে পারব না। আসল কর্তব্য হবে তাদের বোঝানো, সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের আত্মনির্ভরতা জাগ্রত করা। এই কারণে গ্রাম-পঞ্চায়েৎ এবং পল্লী-সমবায়ের এত গুরুত্ব। তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে, এই যুক্তির কিছু সারবত্তা হয়তো আছে, কিন্তু প্রকৃত কোনো সিদ্ধান্ত নেই। ঝুঁকি নিতেই হবে, কারণ একমাত্র সেই-ভাবেই জনসাধারণ পরীক্ষা ও ভুলভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে শিক্ষালাভ করবে।

সাড়ে ছ'বছর আগে ভারতবর্ষে কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট আন্দোলন আরম্ভ হয়। এখন তিন লক্ষ গ্রাম তার আওতায়। এ এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং আমি মনে করি, দেশের মধ্যে এর ফল বৈপ্লবিক হবে এবং কতক পরিমাণে হচ্ছেও। এর অসাফল্যের দিকটা আমার অজানা নয়, কিন্তু সাফল্য তো আরও প্রত্যক্ষ। জনসাধারণ এর সঙ্গে কতখানি সহযোগিতা করছে তার ওপর নির্ভর করবে সার্থক ফল। কর্মচারী এবং শিক্ষা-প্রাপ্ত কর্মীদের গুরুত্ব আছে ঠিকই, কিন্তু আসল ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে সাধারণ কৃষককে। আমি মনে করি কমিউনিটি ডেভলাপমেণ্ট পরিকল্পনার ফলে গ্রামাঞ্চলে এক নতুন মনোভাব ছড়িয়ে পড়ছে।

জমিতেই হোক বা শ্রমশিল্পেই হোক বা সরকারী শাসনযন্ত্রেই হোক, কাজের পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানেরও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মুনাফা-প্রেরণার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন আহরণশীল সমাজ যে সব মূল্যাম্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাদের জায়গায় আসবে নতুন সব মূল্য। সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে সময় লাগবে, কারণ আমাদের

সামনে সমস্যাটা হল কোটি কোটি মানুষের চিন্তা ও কর্মকে তাদের সম্মতি নিয়ে গণতান্ত্রিক-ভাবে বদলে দেওয়া। কিন্তু পরিবর্তনের গতি যে মন্থর হতে হবে এমন কোনো কথা নেই; বস্তুত, অবস্থার কারণেই ধীরে ধীরে আমাদের অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

১৬

ভারতবর্ষের চিত্র আজ অতি বিমিশ্র—একদিকে আশা অন্যদিকে যন্ত্রণা, একদিকে আশ্চর্য অগ্রগতি অন্যদিকে জড়তা, একদিকে নতুন উদ্দীপনা অন্যদিকে অতীতের সুবিধা-ভোগের মৃত হিমস্পর্শ, একদিকে বিকাশমান সর্বাঙ্গীণ ঐক্য অন্যদিকে বিভেদ-বিশৃঙ্খলার দৃশ্য। সব নিয়ে জনসাধারণের মনে ও কর্মে এক প্রবল জীবনী শক্তি ও চাঞ্চল্য। আমরা যারা এই নিত্য পরিবর্তমান দৃশ্যের মাঝখানে রয়েছি সব সময়ে সম্ভবত প্রত্যক্ষ ঘটনার পূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না। এ পরিস্থিতিকে সাধারণত বিদেশীরাই ভালো উপলব্ধি করতে পারেন।

এ এক অসাধারণ ঘটনা, যে দেশ ও জাতি সুদূরে অতীতে বদ্ধমূল এবং পূর্বে পরিবর্তনকে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করেছে, সেই দেশ ও জাতি এখন দৃঢ় পদক্ষেপে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আমরা ভারতবর্ষে ইতিহাস সৃষ্টি করছি। সে সম্বন্ধে হয়তো আমরা সচেতন নই, কিন্তু তবু ইতিহাস আমরা সৃষ্টি করছি।

বর্তমানের শ্রম ও চাঞ্চল্য থেকে কি সৃষ্টি হবে? আগামীকালের ভারতবর্ষ কি রকম হবে আমি বলতে পারি না। আমি শুধু আমার আশা ও কামনা ব্যক্ত করতে পারি। স্বভাবতই আমি চাই, ভারতবর্ষ বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতি করুক, তার বিশাল জনসমষ্টির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে তার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিষ্পন্ন করুক। আমি চাই, ধর্ম বা বর্ণ, ভাষা বা প্রদেশের নামে আজকের এই সব সংকীর্ণ বিরোধ অন্তর্হিত হোক এবং এক শ্রেণীহীন বর্ণভেদহীন সমাজ গড়ে উঠুক, যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি তার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুসারে বিকাশ লাভের সুযোগ পাবে। বিশেষভাবে আমি আশা করি, বর্ণের অভিসম্পাত নিশ্চিহ্ন হবে, কারণ বর্ণের ভিত্তিতে কি গণতন্ত্র কি সমাজতন্ত্র কোনোটাই সম্ভব নয়।

চারটি বিরাট ধর্ম ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছে। তার নিজের চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয় দুটি : হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম; এবং দুটি আসে বিদেশ থেকে, কিন্তু ভারতবর্ষে তারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় : খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম। বিজ্ঞান আজ ধর্মের প্রাচীন প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ধর্ম যদি যুক্তিনিরপেক্ষ অনড় মতামত এবং আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে না থেকে জীবনের উচ্চতর বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত হয়, তাহলে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের এবং এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বিরোধ ঘটার কথা নয়। এই সমন্বয় সাধনে সাহায্য করবার অসামান্য সৌভাগ্য ভারতবর্ষের হতে পারে। সে কাজ হবে অশোক লিপিতে উৎকীর্ণ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অনুসারী। অশোকের এই বাণী আমরা আজ স্মরণ করব :

"আত্মিক শক্তির বৃদ্ধি বহু প্রকারের।

"কিন্তু মূল হল বাকসংযম : স্বধর্মের প্রশংসা এবং অন্য ধর্মের নিন্দা অথবা বিনা উপলক্ষে বা বিনা প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে লঘু মন্তব্য পরিহার করা।

"উপযুক্ত উপলক্ষ্য দেখা দিলে অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদেরও যোগ্যভাবে সম্মানিত করা উচিত। যদি এই ভাবে আচরণ করা যায় তাহলে স্বধর্মকে অধিকতর

মর্যাদা দান করা হয় এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও সাহায্য করা হয়। এর বিপরীত আচরণ যদি করা হয় তাহলে স্বধর্মের অনিষ্ট করা হয় এবং অন্য ধর্মেরও অপকার করা হয়।

"যে স্বধর্মকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু অপরকে তার স্বধর্মের প্রতি আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করবার চেষ্টা করে এবং যে স্বধর্মকে অন্য সকল ধর্মের চেয়ে বড় বলে প্রচার করে, সে নিশ্চিতভাবে তার স্বধর্মের অনিষ্ট করে।"

অশোকের কালে সমস্ত বিশ্বাস ও কর্তব্য ধর্মের অন্তর্গত ছিল। আজ আমরা ধর্ম নিয়ে তত কলহ করি না, কলহ করি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় এবং আদর্শ নিয়ে। কিন্তু রাজনীতি বা অর্থনীতিতে ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি আচরণে আমরা অশোকের উপদেশ অনুসরণ করতে পারি। অশোকের মনে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কোন স্থান ছিল না, আজও তার কোনো স্থান না থাকাই উচিত।

আজকের চেষ্টায় আমরা যে রকম গড়ব আগামী কালের ভারতবর্ষ সেই রূপ নেবে। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ভারতবর্ষ শ্রমশিল্পে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে যাবে; বিজ্ঞানে ও টেক্‌নলজিতে সে উন্নত হবে; আমাদের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উঁচু হবে, শিক্ষা বিস্তার লাভ করবে, স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও ভালো হবে এবং শিল্প ও সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করবে। আমরা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নির্ভীক হৃদয়ে এই তীর্থ-যাত্রায় বেরিয়েছি, যাত্রা যতই দীর্ঘ হোক লক্ষ্যস্থলে আমরা নিশ্চয়ই পৌঁছব।

কিন্তু আমার চিন্তা শুধু আমাদের বৈষয়িক অগ্রগতি নিয়েই নয়, আমাদের জনসাধারণের চরিত্রের গুণ ও গভীরতার কথাও আমি ভাবি। শিল্প-প্রগতির দ্বারা ক্ষমতা আহরণ করে তারা কি ব্যক্তিগত ধনসম্পদের অন্বেষায় এবং আরামের জীবনযাপনে নিজেদের হারিয়ে ফেলবে? তা এক মর্মান্তিক ব্যাপার হবে। কারণ তার দ্বারা ভারতবর্ষকেই অস্বীকার করা হবে এবং ভারতবর্ষ অতীতে এবং আমার বিশ্বাস বর্তমানেও গান্ধীজী তাঁর জীবনে যা প্রচার ও সমর্থন করেছেন তাকেই নস্যাৎ করা হবে। শক্তি প্রয়োজন, কিন্তু বিজ্ঞতা আরো প্রয়োজন। বিজ্ঞতা ও শক্তির সমন্বয়ই একমাত্র কল্যাণকর।

আজকাল আমরা সকলেই অধিকার ও সুবিধার কথা বলি এবং তা দাবী করি। কিন্তু প্রাচীন ধর্মের শিক্ষা ছিল কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে। কর্তব্য সম্পাদন করলেই তবে অধিকার জন্মায়।

আমরা কি অন্তর ও মনের এই প্রগতির সঙ্গে বিজ্ঞান ও টেক্‌নলজির প্রগতিকে সংযুক্ত করতে পারব? আমরা বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠাহীন হতে পারি না, কারণ বিজ্ঞান বর্তমান জীবনে মূল বাস্তব সত্যের প্রতিভূ। কিন্তু যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ যে মৌল নীতি সমর্থন করে এসেছে তার প্রতি নিষ্ঠাহীন হওয়া আমাদের আরও অনুচিত। অতএব আমরা যেন আমাদের সমস্ত শক্তি ও উদ্যম নিয়ে শিল্প-প্রগতির পথ অনুসরণ করি এবং সেই সঙ্গে যেন মনে রাখি যে, সহনশীলতা, করুণা ও বিজ্ঞতা ছাড়া বৈষয়িক সম্পদ ধূলি ও ভস্মে পরিণত হতে পারে। আমরা এ কথাও যেন মনে রাখি যে "শান্তি স্থাপন যারা করে তার ধন্য।"*

অনুবাদ : অরুণ মিত্র

* আজাদ স্মৃতি-বক্তৃতা, ১৯৫৯

কাব্যপ্রত্যয়

অমলেন্দু বসু

প্রশ্ন উঠেছে, কাব্য ও প্রত্যয়, এ-দুইয়ে কী সম্পর্ক? কোনো কাব্যের রসমাধুরী উপভোগ করছি, একথার মানে কি এই যে সে-কাব্যের বক্তব্যবস্তুটি সত্য ব'লে মেনেছি? অথবা, প্রশ্নটি ঘুরিয়ে বলা যাক : যদি কোনো কাব্যের বক্তব্যবস্তুতে আমার প্রতীতি না থাকে অথবা মাত্র অংশতঃ থেকে থাকে, তাহলে সে-অনুপাতে আমার রসসম্ভোগও কি মাত্রই আংশিক অথবা সম্পূর্ণ ব্যাহত? কাব্যসম্ভোগ ও কাব্যবস্তুতে প্রত্যয়, এ-দুই ভিন্ন না অভিন্ন?

দুয়েকটি কাব্যের উল্লেখে প্রশ্নটিকে আরো বিশদ করা যাক। ইংরেজি কাব্যের উল্লেখে। মিল্‌টনের "প্যারাডাইজ্‌ লস্‌ট্‌" খ্যাতিমান কাব্য, বহু পাঠকের মতো আমি এর অনুরাগী—কোনো কোনো প্রভাবশালী আধুনিক পণ্ডিতের মিল্‌টন্‌-বিরোধিতা সত্ত্বেও। অথচ এই কাব্যগ্রন্থের আখ্যানটি আমি নিছক কপোলকল্পনার অধিক মনে করিনে, এর অন্তর্গত ধর্মশাস্ত্রীয় তর্কে আমি আকৃষ্ট হইনে। আমি যদি ক্রিশ্চ্যান হতাম, ইয়োরোপীয় হতাম, সতেরো শতকী ইংরেজ পিউরিটান হতাম, তাহলে কে জানে হয়তো আদম-হবার আখ্যানটি সত্য ব'লে গ্রহণ করতে পারতাম, আর যদি ইহুদী ক্যাথলিক অথবা ইসলামী পুরাণে বিশ্বাসী হতাম, তাহলেও আখ্যানটির সত্যতায় বিশ্বাস করতে পারতাম যদিও ঠিক মিল্‌টনের অনুভাবনায় নয়। কিন্তু আমার নিজ প্রত্যয়গুলির ধর্মীয় ও সামাজিক পশ্চাৎপট অন্যরূপ আর বস্তুতঃ কোনো পৌরাণিক আখ্যানকেই আমি ঐতিহাসিক সত্য ব'লে গ্রহণ করিনে। আখ্যানের ঐতিহাসিকতায় অপ্রত্যয়ী হয়েও আমি "প্যারাডাইজ লস্‌ট্‌" কাব্যের অনুরাগী, সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিদেনে একজন সাহিত্যপাঠকের ক্ষেত্রে প্রত্যয়াভাব রসাস্বাদনের বিপন্থী নয়। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, আমি যদি আখ্যানভাগে পূর্ণপ্রত্যয়ী হতাম, তাহলে কি আমার রসসম্ভোগ আরো নিবিড়, আরো সমৃদ্ধ হত?

মূল প্রশ্নের কয়েকটি অনুপ্রশ্ন আছে। প্রত্যয়-সমস্যার একদিকে দেখছি কাব্যের বিষয়বস্তুতে পাঠক প্রত্যয়হীন অথচ কবি স্বয়ং প্রত্যয়ী। এই সঙ্গে এও কি সম্ভব নয় যে কাব্যের আখ্যানে (অথবা তার অংশ বিশেষে) অথবা আখ্যান সঞ্জাত চিন্তায় ও ভাববস্তুতে কবি নিজেই অপ্রত্যয়ী অথবা অগভীরপ্রত্যয়ী? দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবার মিল্‌টনের উল্লেখ প্রয়োজন। দেখতে পাই "প্যারাডাইজ্‌ লস্‌ট্‌"-এর সৌরজগৎ টলেমির মতানুসারী যদিচ মিল্‌টন্‌ শুধু যে গ্যালিলেওর সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন এমন নয়, তৎকালীন ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তার সূক্ষ্ম আবিষ্কারাদি সম্বন্ধেও ওয়াকিফ্‌হাল ছিলেন আর বিলক্ষণ জানতেন যে কোপার্ণিকাস্‌-এর নবগণনার অভিসংঘাতে প্রাচীন গ্রীক জ্যোতিষশাস্ত্র অচল হয়ে গেছে। এ এক আশ্চর্য ব্যাসকূট। যে-ভাবনা অগ্রাহ্য হয়েছে কবির আপন জ্ঞানমঞ্জুষায় সে-ভাবনাকেই তিনি সাদরে ব্যবহার করেছেন কাব্যের অলঙ্করণে। শিল্পীপ্রত্যয়ে যার অস্তি, ফলিত বিশ্বাসে তারই নেতি। আরেক দৃষ্টান্তে ইয়েট্‌স্‌-এর উল্লেখ করতে হয়। ইয়েট্‌স্‌ আজীবন ছিলেন অলৌক সন্ধানী কিন্তু তাঁর কাব্যবিবর্তনের তৃতীয় স্তরের ভিত্তি হিসাবে জ্যোতিষ-গণিত-প্রেততত্ত্ব প্রভৃতির যে পাঁচমিশেলি চিন্তা-সমুচ্চয় তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তাতে তাঁর নিজেরই সম্যক মনীষিক প্রত্যয় ছিল না অথচ

সে-চিন্তা সমুচ্চয় তাঁর অনেক মহৎ কবিতার তাত্ত্বিক পশ্চাৎপট। এক্ষেত্রেও দেখছি কবির মনীষাগ্রাহ্য বিশ্বাসে ও শিল্পী প্রত্যয়ে অসংগতি, ব্যবহারিক জ্ঞানে ও রসজ্ঞানে ব্যবধান, সৃজনীকল্পনার সত্য ও বুদ্ধিনির্ভর সত্য যেন দুটি প্রভিন্ন সত্য।

আরেকটি জ্ঞাতিপ্রশ্ন তুলতে হচ্ছে। যদি বলি যে কাব্য সম্ভোগ মানেই কাব্যের বিষয় বস্তুতে প্রত্যয়, অর্থাৎ সম্ভোগ ও প্রত্যয় চলে সমতালে, তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে—কাব্যের কোনো চিরন্তনতা আছে কিনা। কাব্যের বিষয়বস্তু বলতে কোন্‌ বস্তু বুঝব?—ব্যবহারিক জীবনের তথ্য ও বিষয় বুঝব তো? তা নইলে প্রশ্নটি আদৌ ওঠে কেমন করে? আর তা যদি বুঝি, তাহলে কাব্যের চিরন্তনতায় সংশয় জাগা সম্ভব কেন না ব্যবহারিক জগতের তথ্য ও বিষয়, ব্যবহারিক জীবনের সত্য, সদাপরিবর্তনশীল, দেশে দেশে পুরুষ পর্যায়ে পুরুষ পর্যায়ে মানুষে মানুষে বদলায়। জীবনেরও সংস্কৃতির মূল্যমান বদলায়। এই অধ্রুব সত্য ও মূল্যের প্রভাবে কাব্যমূল্যও বদলাবে, আজকের কাব্য বাতিল হবে আগামী কালে, কাব্যের কোনো শাশ্বত রস থাকবে না। (বেশি এগোবার পূর্বেই বলা ভালো যে শাশ্বত বলতে নিরবধি কালের কথা ভাবছি না, ভাবছি ইতিহাস-আশ্রস্ত গণনাসাধ্য কয়েক শতাব্দীর কথা, যে বিশ ত্রিশ শতাব্দীকালে দর্শনে ও শিল্পে মানুষের অন্তঃশক্তির প্রকাশগুলি মোটের উপরে অপরিবর্তিত মূল্যের মর্যাদা পেতে পারে।) যদি এই দাবি করি যে কাব্যে প্রতিফলিত হবে ব্যবহারিক জীবনের সত্য, তাহলে অনেক প্রাচীন ও ধ্রুপদী কাব্য অচল হয়ে যাবে আজকের দিনে। বস্তুতঃ "রঘুবংশম্‌", "ইন্‌ফার্ণো", "হ্যামলেট" অবধি আজ বাতিল হতে পারে যদি আমাদের কাব্যসম্ভোগস্পৃহা নিয়ত কেবল ফলিত সত্যের সন্ধান করে। মহৎ কাব্য কি নিতান্তই যুগধর্মসাপেক্ষ, তার কি কোনো স্বয়মুজ্জ্বল শিল্পধর্ম নেই?

যদি বলি যে পাঠকের কাব্যানন্দ প্রত্যয়নিরপেক্ষ, কাব্যবস্তুতে তাঁর বিশ্বাস না থাকলেও কাব্যরস তাঁর ভোগায়ত্ত, তাহলে অন্য সংশয় জাগে—কাব্যবস্তুতে প্রত্যয় কি কাব্যরস থেকে আলাদা? স্পেন্‌সারের রেড্‌ ক্রশ্‌ নাইটের উপাখ্যান উড়িয়ে দিলাম গালগল্প বলে অথচ স্বীকার করলাম তিনি উৎকৃষ্ট কবি কেন না ছন্দোমাধুর্যে ও বাক্‌প্রতিমার সৌন্দর্যে তিনি অতুলনীয়, এ হেন দ্বৈততা কি সদ্বিবেকী সমালোচনায় সম্ভব অথবা গ্রাহ্য? একদিকে বলছি যে বুলি বট্‌ম্‌-ওবেরণ-টিটানিয়ার কাহিনীটি নেহাৎই আষাঢ়ে গল্প—শেক্‌স্‌পীয়র নিজেই নাম দিয়েছেন "মিড্‌ সামার নাইট্‌স্‌ ড্রীম"—আরেক পক্ষে বলছি এ-রচনায় কবিত্বরস অপূর্ব, এহেন উক্তিতেও কোনো অপরিচ্ছন্ন চিন্তার ও বিভ্রান্ত সংবেদনার লুতাতন্তু বিদ্যমান।

এতগুলি প্রশ্ন উত্থাপনের পরে আরো দুটি বিষয়ে অবহিত হয়ে প্রশ্ন সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া যাবে। প্রথমতঃ মনে রাখা দরকার যে কাব্যে প্রত্যয়ের সমস্যা প্রধানতঃ চিন্তা-গর্ভ কাব্যে নিহিত। যে-কাব্য কোনো দার্শনিক ধর্মীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব আত্মসাৎ করেছে, কোনো আখ্যানকথনে নিযুক্ত হয়েও পাঠকের মনে তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদ্রেক করেছে, অর্থাৎ যে-কাব্যে কবি শুদ্ধ অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ না হয়ে কোনো মননক্রিয়ায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন, সে-কাব্যেরই মূল্যায়নে প্রত্যয়ের প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা অনুসারে কবিত্ব এক ধরনের মনন ক্রিয়া। উপনিষৎগুলির ভাষ্য রচনাকালে শঙ্করাচার্য একাধিকবার "কবি" শব্দটির তাৎপর্য করেছেন "ক্রান্তদর্শী" "মেধাবী" অর্থে, সে-অর্থে কবি অবশ্যই মননক্রিয়াশীল পুরুষ। মননক্রিয়া ব্যতীত প্রত্যয়ের সমস্যা উঠতে পারে না, আর যেহেতু

কাব্যের যে-কোনো বিষয়বস্তুতে, যে-কোনো প্রকারের কাব্যে (গীতি-উদ্বেল বিশুদ্ধ লিরিক কাব্যেও অল্প বিস্তর মননক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী সে জন্য প্রায় সব কাব্যের আলোচনাতেই প্রত্যয়-সমস্যা অনুলিখিত।

দ্বিতীয় কথা, এ-সমস্যা শিল্পীর বা কবির নিজের সমস্যা নয়, এ-সমস্যা পাঠকের ও সমালোচকের। কবি তাঁর সৃষ্টির বোঝা নামিয়ে খালাস, এখন দায়িত্ব সমালোচকের। কবি যদি বিচক্ষণ সমালোচকও হন—যেমন কোল্‌রিজ্‌ ও এলিয়ট—তাহলে তাঁর বিশ্লেষণ আমাদের শ্রদ্ধার্হ, তাঁর বিশ্লেষণের সাহায্যে আমাদের বিচার নিশ্চয়তা পেতে পারে, কিন্তু অপর পক্ষে কবিরা সব সময়ে বিচক্ষণ না-ও হতে পারেন, অনেক সময় স্বীয় সৃষ্টি তাঁদের কাছে ব্যাখ্যানাতীত রহস্য বলে মনে হতে পারে (কৌতূহলী সোক্রাটেস যেমন তাঁর প্রশ্নের ঝুলি নিয়ে অনেক কবির কাছে উপস্থিত হয়ে স্তব্ধবাক রহস্যবোধের অধিক কোনো বুদ্ধি-গ্রাহ্য উত্তর অথবা আলোচনা পাননি), আর সে জন্যই সৎ সমালোচকের দায়িত্ব গুরুভার, তাঁর বুদ্ধি বিদ্যা ও শৈল্পিক সংবেদনার মান বেশ উঁচু হওয়া দরকার। প্রত্যয়ের সমস্যায় সমালোচকের মেধা নিষ্ঠা ও সার্বিক যোগ্যতার কঠিন পরীক্ষা।

২

কাব্যপ্রত্যয়ের সমস্যা আধুনিক সভ্যতার খুবই যুগসম্মত লক্ষণ কেননা শিল্পীর বিশ্বাসে (ধর্ম, রাজনীতি, দর্শন, সব রকম তত্ত্বজ বিশ্বাসে) ও পাঠকের বিশ্বাসে যে-অসংগতি ও বিরোধ জন্মেছে বিগত দুই শতাব্দীর যন্ত্রনির্ভর সমাজ-বিন্যাসের অবধারিত পরিণাম হিসাবে, প্রাক্‌-রেনেসাঁস ইয়োরোপে (এবং বিংশ শতকী এশিয়ায় ও আফ্রিকায়) তার কোনো ব্যাপক সচরাচরিক প্রকাশ নেই। ষোড়শ শতক পর্যন্ত যে-কোনো যুগে, যে-কোনো সমাজে, মানুষে মানুষে চিন্তার ও সংবেদনার মোটামুটি অভিন্নতা ছিল এমন বলা অপভাষণ নয় যদিও একথা বলার সময় অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে সামাজিক চিন্তা সে-সব কালেও অখণ্ড বস্তু ছিল না, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে তখনো বিরাজ করত ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও সংবেদনা—কিন্তু তা হলেও তো বলা চলে যে সে-সমস্ত টুকরো সমাজগোষ্ঠীর খণ্ডিত গণ্ডীতে সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা ছিল!—আর একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে চিন্তা ও সংবেদনার অভিন্নতার মানে এই নয় যে কোনো দ্বিতীয় চিন্তা একেবারেই অনুপস্থিত, অনুদ্ভব। চিন্তার একচেটিয়া অস্তিত্ব এ-কালের টোটেলিটারিয়ান সমাজেই সম্ভব হয়েছে। হয়েছে অসহিষ্ণু হিংসাপরায়ণ নিষ্ঠুর অপরবিনাশী কার্যকলাপের ফলে। অতীতে কোনো সমাজেই, ধর্মোন্মত্ত গোঁড়া সমাজেও, অবিচিত্র একবর্ণ-চিন্তার স্টীমরোলার্‌ চলে নি যা আমরা এ-শতাব্দীর ইয়োরোপে এবং সম্প্রতি এশিয়ায় দেখতে পাচ্ছি। প্রবল ও প্রধান একটি চিন্তা অবশ্য সব সমাজেই থেকেছে কিন্তু সেই চিন্তাবৃত্তের স্পর্শরেখায় (tangent) অন্য চিন্তারও স্থান হয়েছে। সুতরাং যে-অভিন্নতার কথা বলেছি তা আপেক্ষিক, রেলেটিভ্‌, নিতান্তই নিরঙ্কুশ নয়।

যতদূর জানি তাতে মনে হয় যে প্রাক-রেনেসাঁস ইয়োরোপে সমাজমানস ছিল সমজাতিক (homogeneous), অন্ততঃ আধুনিক বহুধাবিভক্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন সমাজ-মানসের তুলনায় তো বটেই। আর সেই সমজাতিকতার কারণে শিল্পী তাঁর চারিদিককার ভাবমণ্ডলের সঙ্গে স্বীয় ভাবানুভূতির কোন বিভ্রমকারী অসংগতি বোধ করতেন না। যে-অস্ফুট গোঙানি

আজ আধুনিক কবির বিমথিত হৃদয় থেকে উৎসারিত, যে-নিরবকাশ অন্তর্দ্বন্দ্বে কবির চিত্ত ও মেধা বিপর্যস্ত ও শিথিল, তাঁর কাব্য যার ফলে একান্তই আত্মসংস্থ (subjective) ও ব্যাধিত, সে-বেদনার উদ্ভব মূলতঃ আধুনিক শিল্পীমানসের নিরন্তর একাকীত্ব বোধে।

Alone, alone, all all alone,
Alone, on a wide wide sea.

Yes, in the sea of life enisled,
We mortal millions live alone.

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।

আধুনিক কাব্যের সর্বাধিক ব্যবহৃত শব্দ এই alone, আর আধুনিক শিল্পীমানসের নির্যূত প্রতীক এই অগণন বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট দ্বীপ-ছড়ানো বিস্তীর্ণ সমুদ্র, যে-প্রতীক বা যে-প্রতীকভাবনা ছড়িয়ে আছে রিল্‌কে, ইয়েট্‌স্‌, এমিলি ডিকিন্‌সনের কবিতায়। আমি এমন বলছিনে যে বিষণ্ণ সুরে আধুনিক কাব্যেরই বৈশিষ্ট্য। তা নয়। সর্বযুগের কাব্যেই কোথাও না কোথাও বিষণ্ণ সুর মেলে কেন না বিষাদ তো সার্বজনিক জীবনবোধেরই একটা দিক। টিউডর কবি, মধ্যযুগীয় ব্রুবাদুর কবি, স্যাক্‌সন্‌ কবি, লাতিন কবি ও গ্রীক কবির রচনায় বিষাদ প্রচুর, সংস্কৃত কাব্যে মোটেই অপ্রচুর নয়। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে বিষণ্ণ সুর কমবেশি বর্তমান, এমন কি যেখানে সূক্ষ্ম বেদনার প্রত্যাশা করিনে—কাশ্মীরের গ্রামাঞ্চলে, কাংড়া উপত্যকায়, আরাবল্লীর পাহাড়ে, পূর্ববঙ্গে পূরুষানুক্রমিক নৌকাবাসীর সমাজে—সেখানেও লোকসঙ্গীতে বিষণ্ণ সুর আদৌ বিরল নয়। কিন্তু বিষণ্ণ সুরেরও আধুনিক ও প্রাগাধুনিক দুটি রূপ আছে। কোলরিজ ও জীবনানন্দর যে-ছত্রগুলি উপরে উদ্ধৃত করেছি তাতে যে-অতীব আত্মসংস্থ কবিচিত্তের নিঃসঙ্গ জীবনক্লান্ত মানসের পরিচয়, প্রাগাধুনিক কাব্যের অথবা লোকসঙ্গীতের সমধিগ্রাহ্য বেদনায় তা পাওয়া যাবে না। এ-কালের কাব্যে ও তার পরিবেশে যে-আত্মসচেতন ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়, চসর্‌-পেত্রার্ক-দান্তে, কাটুল্লুস্‌-প্রপার্শিয়াস-ভর্জিল প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের কাব্যপ্রত্যয়ে ও তদানীন্তন কাব্যামোদীর ব্যবহারিক প্রত্যয়ে তেমন কোনো ক্লেশকর বিরোধ ছিল বলে জানা যায় না।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির রুচি ও প্রত্যয়বিভেদে সাম্প্রতিক কাব্যপ্রত্যয়ের সমস্যা নিষণ্ণ। যেহেতু প্রাগাধুনিক কালে ব্যষ্টি ও সমষ্টির চিন্তাধারায় ও সংবেদনায় কোনো ব্যাপক গভীর প্রবল বিভেদ ছিল না সেজন্য কাব্যপ্রত্যয়ে ও ব্যবহারিক প্রত্যয়ে, কবির নিজ প্রত্যয়ে ও তাঁর পাঠক সমষ্টির প্রত্যয়ে, উল্লেখযোগ্য বিভেদ থাকত না। "কুমার সম্ভব", "উত্তর রামচরিত", কাশীরাম দাসের "মহাভারত" ও "অন্নদামঙ্গলের" পাঠকের চিত্তে এসব কাব্যের আখ্যান (তা সে যতই অলৌকিক হোক না কেন) আর এ সব কাব্যের ভাবপ্রত্যয় কোনো সমস্যা বা সংশয়ের উদ্রেক করেনি। বস্তুতঃ ব্যষ্টিমানসে ও সমষ্টিমানসে সেকালে এতই নিবিড় সংগতি ছিল (বিশেষতঃ বাঙলা দেশে) যে ধর্মবিভেদেও শৈল্পিক প্রত্যয়বিভেদ ঘটেনি। মুসলমান কবি হিন্দু পুরাণ নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন, হিন্দু পুরাণে আল্লাহ অবতীর্ণ হয়েছেন, একই প্রতীক সম্বলিত বাউল গান লিখেছেন হিন্দু ও মুসলমান কবি। ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সাহিত্য চিন্তার সঙ্গে আমার যেটুকু অসম্যক পরিচয় আছে তাতে এমন জানি নি যে প্রত্যয়-বিভেদের কোনো গভীর প্রশ্ন অতীতে উঠেছিল। এ-সমস্যা জন্মলাভ করেছে অধুনা আর

জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হয়েছে। ইদানীংকার কাব্যপাঠকালে আমরা মুহুর্মুহুঃ সংশয়পীড়িত হয়ে থাকি, প্রতিনিয়তই বোধ করি কবিপ্রতীতির সঙ্গে কাব্যপ্রত্যয়ের সঙ্গে নিজেদের বিশ্বাসে অসংগতি বিদ্যমান।

এ-অসংগতি সাহিত্যের ও শিল্পের ইতিহাসের অবিস্মর্তব্য অধ্যায় কিন্তু কেবল সাহিত্যের ও শিল্পেরই অধ্যায় নয়, সমগ্র আধুনিক জীবনের অধ্যায়। অসংগতির উদ্ভব কোথায় সে অতি জটিল ও দুরূহ প্রশ্ন, তার আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের এলাকার বাইরে আর আমার বিশ্লেষণ-ক্ষমতারও বাইরে কিন্তু যে-সমালোচক ভুলে যাবেন যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিভেদ আজ সহস্রস্রোতা আর সাহিত্যে তার একটিমাত্র স্রোতেই প্রবাহিনী, সাহিত্যিক সংশয় সামগ্রিক সংশয়ের অংশমাত্র, তাঁর সাহিত্যিক প্রবেশপথ হবে ভ্রান্ত, সাহিত্য-সন্দর্শন হবে বিকৃত ছায়াচ্ছন্ন।

৩

কাব্যপ্রত্যয়ের আলোচনায় কিছুদূর অগ্রসর হবার পর আমরা একটি মস্ত অংগীকারে (assumption) পৌঁছই : প্রত্যয় সংক্রান্ত সমস্যাগুলিতে এই মেনে নেওয়া হয়েছে যে কাব্যের বিষয়বস্তু ও কাব্য সমার্থক, কাব্যের সঙ্গে অনুস্পন্দিত হতে হলে কাব্যের বিষয়বস্তু গ্রহণ করলেই হল। কাব্য মানেই কাব্যের বক্তব্য। আলোচক মনে করেন যে অখণ্ড কাব্যসত্তা থেকে কবিতাটির বুদ্ধিগ্রাহ্য বক্তব্যটি যদি নিষ্কাশিত করে নেওয়া যায়, যদি তিনি বলতে পারেন 'বলাকা' কবিতাটির বক্তব্যনির্যাস কী এবং তার সঙ্গে উপনিষদের "চরৈবেতি" ভাবনার অথবা বের্গ্‌সঁ'র "এলাঁ ভিতাল" ভাবনার জ্ঞাতিত্ব কোথায়, যখন জানলেন বিজ্ঞানশিরম্ নগরীর উল্লেখে কোন প্রতীকভাবনা ব্যঞ্জিত হয়েছে ইয়েট্‌সের কবিতায়, তখন নিরুদ্বেগ তৃপ্তচিত্তে তিনি নানারূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারেন। আলোচনা করবেন কবিতার বিচ্ছিন্ন বক্তব্যটি অন্য কোন্ কবির বক্তব্যের সঙ্গে অন্বিত অথবা বিযুক্ত, বক্তব্যটি পাঠকের প্রত্যয়সাধ্য কিনা, জাতির কৌমের ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলদায়ক কিনা, কবির স্বীয় ব্যবহারিক প্রত্যয়ের সঙ্গে সংগত কিনা—যে সব ইত্যাকার পাঁণ্ডতী আলোচনার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কবির ক্ষমাহীন বিদ্রূপ :

বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরঢ় ভণিতা;
পাণ্ডুলিপি, ভাষা, টীকা, কালি আর কলমের পর
বসে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর অক্ষর।

কবির উপহাস কোনো অবায় সত্য নয়, তবুও এসব কাব্য-ব্যবচ্ছেদী আলোচনায় আসল কবিতাটিকে পাই কি? কবির সৃষ্টিতে যা হয়েছিল অখণ্ড অদ্বৈত উজ্জ্বল, অসংবেদী আলোচনায় তাকে করা হল বহুধাবিভক্ত। অংগীকার যেমন মস্ত, তার ভ্রান্তি তার চেয়েও মস্ত কেননা তার ফলে শিল্পের শিল্পত্ব, কবিতার কাব্য, যায় হারিয়ে। একথা সত্য যে বিশ্লেষণী আলোচনায় পাঠকচিত্ত শিক্ষিত হয়, নিয়মবলিষ্ঠ হয়, তার ফলে আমাদের পরবর্তী কাব্যপাঠ হয় সমৃদ্ধতর কিন্তু যাবতীয় আলোচনার গোড়াতেই একটি অলঙ্ঘ্য সতর্কবাক্য স্মরণ রাখতে হবে যে সৎ কবিতা অখণ্ড। যে-বিশ্লেষক, যে-গবেষক, যে-তথ্যসন্ধানী কবিতার অখণ্ডরূপ বিচ্ছিন্ন বিপর্যস্ত নিরন্বিত করে স্বকার্যে অগ্রসর হয়েছেন তাঁরই কাজ বস্তুতঃ আত্মঘাতী।

অতএব যদি কোনো পাঠক বলেন যে কবিতাটির ধর্মতত্ত্ব অথবা রাজনৈতিক ধারণা অথবা দার্শনিক প্রতীতি তাঁর অমনঃপূত, তাহলেও সেটা রসবিচার হবে না, হবে ধর্মতাত্ত্বিক রাজনৈতিক বা দার্শনিক বিচার। পাঠক বলেছেন বটে যে তত্ত্ববিশেষে তিনি অপ্রত্যয়ী তবুও যদি তাঁর সং সংবেদনা থেকে থাকে তাহলে নিজ ব্যবহারিক প্রত্যয় অপ্রত্যয় সত্ত্বেও সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুরাগী হতে বাধা নেই। এ-প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে বলেছি যে মিল্‌টনের ধর্মতত্ত্বে অপ্রত্যয়ী হয়েও আমি "প্যারাডাইজ্ লস্ট"-এর অনুরাগী, "মিড সামার নাইট্‌স্ ড্রীম" উপভোগ করার জন্য দরকার নেই যে বিশ্বাস করব বুলি বট্‌মের মুণ্ডুটা বাস্তবিকই গাধার মুণ্ডু হয়ে গেল। কোনো অবশ্যতা নেই যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্ভোগের জন্য আমাকে মার্ক্‌সবাদী হতে হবে অথবা জেরাল্ড্ ম্যান্‌লি হপ্‌কিন্‌স-এর কবিতার জন্য রোমান ক্যাথলিক। বস্তুতঃ এমনও অবশ্যতা নেই যে কবির ব্যবহারিক প্রত্যয় ও তাঁর শিল্পপ্রত্যয় অভিন্ন হবে যেমন হয়েছিল ব্লেইকের বেলায় কিন্তু ইয়েট্‌স্-এর বেলায় নয়। আরো দেখা যায় একই কবির কাব্যপ্রত্যয় আজ যেমন আছে কাল তেমনটি ছিল না। ক্যাথলিক বংশজ ডান্ অ্যাংলিকান হয়ে গিয়েছিলেন, বিপ্লবী ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ রূপান্তরিত হয়েছিলেন রক্ষণশীলে।

আমার বক্তব্য যে কাব্যীভূত প্রত্যয়ে ও ব্যবহারিক বিশ্বাসে অনেক প্রভেদ—একথাই এ-প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য—এতই প্রভেদ যে এ দুই প্রত্যয় সমার্থক জ্ঞান করা না বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক না রসসম্ভোগের অনুকূল। আমি বলছিনে যে এ-দুই প্রত্যয়ে কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই বটে, যেমন ঘনিষ্ঠ গোলাপ ফুলটি আর ফুলগাছটির জমি ও আবহাওয়া। যেহেতু ফুলে আনন্দ পাই, ফুলের শোভায় বিশ্বাসী, সেজন্য এমন অপসিদ্ধান্ত করব না যে গোড়ার জমিও তুল্য আনন্দের কারণ। মূল ও ফল যে এক বস্তু-নয় তা প্রমাণ করার জন্য ন্যায়শাস্ত্র ঘাঁটা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষ কোনো ধারণা বা উপাখ্যান আমার প্রত্যয়বলয়ের অধিগম্য না হতে পারে—এমন তো হাজারো ধারণা বা উপাখ্যান ছড়িয়ে আছে চারিদিকে—কিন্তু যে-মুহূর্তে সে-ধারণা সমাহিত হয়ে গেল কোনো কবির শিল্পধ্যানে, পরিগ্রহ করল কাব্যের রূপ আর সে-কবিতায় আমার অখণ্ড রসোপলব্ধি হল—সমস্ত পারম্পর্যটি আমি দেখছি পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে, স্রষ্টার নয়, আর কেন তেমন দেখছি সেকথা এ-প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ দিকে বলেছি—যখন সে-ধারণায় ফুটল কবিতা, আর সে-কবিতায় আমি পেলাম আনন্দ, তখন বিষয়বস্তুর ও তার প্রত্যয়ের প্রশ্ন তোলা অবান্তর। তখন বিষয়বস্তু আর বিষয়বস্তু নেই আছে শুধু কবিতা। তখন বিষয়বস্তুতে প্রত্যয় অপ্রত্যয় নেই, আছে শুধু কবিতার আনন্দ, কবিতাটির কাব্যত্বে বিশ্বাস। কাব্যে প্রত্যয়ের প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে যদি প্রাক্‌কাব্য বিষয় ও কাব্যীভূত বিষয়ের যে-প্রভেদ আমি উপরে ব্যাখ্যান করেছি সে-প্রভেদ মেনে নেওয়া হয়। তা মানলে বোঝা যাবে যে আমি সতেরো শতকী ইংরেজ ক্রিশ্চ্যান না হয়েও কি ভাবে "প্যারাডাইজ্ লস্ট্" পাঠে নিরন্তর আনন্দ পাই, ইয়েট্‌স্-এর জ্যোতিষ-প্রেততত্ত্বসঙ্কুল ধারণায় আদৌ বিশ্বাসী না হয়েও তাঁর কবিতা যতবার পড়ি ততবারই মুগ্ধ হই। যদি কোনো প্রত্যয়ঘটিত অসংগতি আমাকে পীড়া দিয়ে থাকে তাহলে সে-অসংগতি আমার ব্যবহারিক প্রত্যয়ে ও কবির ব্যবহারিক প্রত্যয়ে, যেখানে কবি ও আমি দুজনেই মামুলি দুনিয়ার মানুষ। কিন্তু যেখানে কবি কাব্যসৃষ্টিশীল ক্রান্তদর্শী আর আমি সৃষ্টিগ্রাহী রসবেত্তা, যেখানে তিনি দৈনন্দিন জগতের অলক্ষ্য নিগূঢ় কল্পজগতে ধ্যানমগ্ন আর আমি সে-ধ্যানজগতের স্পর্শরেখা ছুঁয়েছি মাত্র, সেখানে ব্যবহারিক

ধারণার প্রবেশ নিষিদ্ধ, অতএব সেক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রত্যয়ের সঙ্গতি অসঙ্গতির বিচার অনাবশ্যক। লৌকিক প্রত্যয় ও কল্পলোকের প্রত্যয় স্বতন্ত্র বস্তু।

এ-প্রসঙ্গে আমারই পূর্বলিখিত একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করলে হয়তো বেমানানসই হবে না :

> সার্থক ও পূর্ণ রসসৃষ্টিতে বিষয় ও রূপ (ফর্ম) প্রভিন্ন থাকে না, বিষয় ও রূপ পরস্পরে অন্তর্নিহিত হয়ে পড়ে। যে-রচনায় বিষয় ও রূপের প্রভেদ প্রকট, সে-রচনা শিল্পের মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি, খানিক দূরে এগিয়েছে হয়তো। সৃষ্টির অনির্বচনীয় মুহূর্তের পূর্বক্ষণ অবধি কবির প্রস্তুতিশীল চিত্তে বিষয় ও রূপ আলাদা থাকতে পারে, তিনি তখন বলতে পারেন আমি অমুক বিষয় নিয়ে লিখব আর অমুক কাব্যরূপ অবলম্বন করব। কিন্তু বিষয় ও কাব্য সমার্থক নয়, রূপ (ফর্ম) ও কাব্যও সমার্থক নয়, কাব্য বস্তুতঃ বিষয়ের ও রূপের অতীত একটি তৃতীয় সত্তা। ব্রাউনিংয়ের অ্যাব্‌ট্ ভোগ্‌লার বড়ো খাঁটি কথা বলেছিলেন that out of three sounds he [the musician] frame not a fourth sound, but a star ; যিনি বুঝতে পারেন নি শিল্পায়িত অভিজ্ঞা ও সে-অভিজ্ঞার উপাদানে প্রভেদ কতটা মৌল প্রকৃতিগত, তিনি কাব্যের তথা শিল্পের স্বরূপ বুঝতে পারেন নি। কাব্যে পরিণত হবার পূর্বে বিষয়-সংক্রান্ত প্রজ্ঞা বা experience এবং ফর্ম সংক্রান্ত প্রজ্ঞা বা experience এক মহত্তর গভীরতর শক্তির (যাকে ইম্যাজিনেশন্, সৃষ্টিশক্তি, কল্পনাশক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে) অরোধ্য জারকরসে সিঞ্চিত চূর্ণিত মথিত হয়ে এমন একটি অবিচ্ছিন্ন তৃতীয় সত্তায় পরিবর্তিত হয়ে যায় যাকেই আমরা বলি কবিতা, তা শুধু বিষয় নয় ফর্মও নয়। সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে-বস্তুটি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় (যেমন প্রেম বা রাজনীতি বা নিসর্গপ্রীতি) অথবা স্বয়ংসম্পূর্ণ ফর্ম (যেমন সনেট, গান বা মহাকাব্য, অথবা পয়ার ত্রিপদী বা ছড়ার ছন্দ), সৃষ্টির পরে তা হয়ে গেল কাব্য, আর তাকে ফর্ম বলতে পারিনে বিষয়ও বলতে পারিনে। যা ছিল প্রেম বা রাজনীতি, যে-প্রেম বা যে-রাজনীতি রামা শ্যামা যে-কোনো ব্যক্তির অভিজ্ঞতাসাধ্য ও অনুভূতিসাধ্য, কবির কল্পনারসে সিঞ্চিত হয়ে, সৃষ্টিকর্মে জারিত হয়ে, তা সাধারণ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির অতীতে এতই দূরে চলে গেল যে তাকে আর প্রেম বা রাজনীতি বলা চলে না, শিল্পায়িত কাব্যীভূত প্রেম বা রাজনীতি বললে বরং কিছুটা যথার্থ হয়। প্রাক্ কাব্য বিষয় ও কাব্যোত্তর বিষয়, এ-দুইয়ে ততই প্রভেদ যতটা ফুলের বীজে ও ফুলটিতে।

ইদানীংকার যে-কোনো সম্বিবেকী সাহিত্যিক বা সমালোচক কাব্যপ্রত্যয়ের স্বরূপ চিন্তায় কবি-সমালোচক এলিয়টের রচনায় অবশ্যই পৌঁছবেন। এ-প্রসঙ্গে এলিয়টের কয়েকটি প্রধান মন্তব্য নিচে তুলে দিচ্ছি :

> I deny that the reader must share the beliefs of the poet in order to enjoy the poetry fully.
>
> (আমি একথা মানিনে যে কাব্য পূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে পাঠককে কবির প্রত্যয়গুলিরও অংশ অবশ্যই নিতে হবে।)

> You are not called upon to believe what Dante believed.
>
> (দান্তে যা বিশ্বাস করতেন আপনাকেও তা-ই বিশ্বাস করতে হবে এমন কোন অবশ্যতা নেই।)
>
> *If* there is 'literature', *if* there is 'poetry', then it must be possible to have full literary or poetic appreciation without sharing the beliefs of the poet.
>
> (যদি সাহিত্য বলে কোনো বস্তু থাকে, কাব্য বলে কোনো বস্তু থাকে, তাহলে কবির প্রত্যয়গুলির অংশীদার না হয়েও সাহিত্যিক রসসম্ভোগ নিশ্চয় সম্ভব।)
>
> If you can read poetry as poetry, you will 'believe' in Dante's theology exactly as you believe in the physical reality of his journey ; that is, you suspend both belief and disbelief.
>
> (যদি কাব্য হিসাবে কবিতা পড়ার পটুতা আপনার থেকে থাকে তাহলে আপনি দান্তের ধর্মতত্ত্বে সে-পরিমাণেই বিশ্বাস রাখবেন যে-পরিমাণে বিশ্বাস হবে যে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত স্থূল বাস্তব কাহিনী বটে, অর্থাৎ, আপনার বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুই-ই ক্ষণনিরুদ্ধ থাকবে।)
>
> There is a difference between philosophical *belief* and poetic *assent*.
>
> (দার্শনিক প্রত্যয় ও কাব্যিক সম্মতি, এ-দুইয়ে প্রভেদ বিদ্যমান।)
>
> We can make a distinction between what Dante believes as a poet and what he believed as a man.
>
> (দান্তে কবিস্বরূপে যে বিশ্বাস করতেন আর সাধারণ মানুষ স্বরূপে যা বিশ্বাস করতেন, এ-দুইয়ে তারতম্য করা সম্ভব।)

উদ্ধৃত উক্তিগুলির চতুর্থটির সঙ্গে তুলনীয় কোল্‌রিজ-এর বিখ্যাত উক্তি that willing suspension of disbelief which constitutes poetic faith (অবিশ্বাস স্বেচ্ছায় ক্ষণ-নিরুদ্ধ হলেই কাব্যপ্রত্যয় গড়ে ওঠে), আর তা ছাড়া এলিয়টের মতামত মোটের উপরে—তিনি নিজেই সে কথা বলেছেন—আইভর্ রিচার্ড্‌স্-এর চিন্তার অনুকম্পায়ী। কখনো কখনো আমার মনে হয় যে এলিয়ট যে কথা বলেছেন আমিও বুঝি বা হুবহু সে কথাই বলছি কিন্তু সতর্কতর দৃষ্টিতে বুঝতে পারি যে এলিয়টের বক্তব্যের চেয়ে আমার বক্তব্য বেশ খানিকদূর অগ্রসর আর সেজন্য প্রত্যয়সমস্যার সমাধানের নিকটতর। এলিয়ট বলেছেন বটে যে তাত্ত্বিক প্রত্যয় ও কাব্যিক সম্মতি আলাদা বস্তু, কিন্তু তিনি সে-প্রত্যয় ও সে-সম্মতির সম্পর্ক বিচার করেন নি। তিনি বলেছেন আমরা কবির প্রত্যয়ের অংশীদার হতে পারি না-ও হতে পারি, অংশীদার হবার কোনো অবশ্যতা নেই। আমার সিদ্ধান্ত যে অবশ্যতা আছে। দান্তের কাব্য যখন পড়ি তখন তাঁর সাধারণ মানুষিক প্রত্যয়ে আমার প্রয়োজন নেই কিন্তু তাঁর কাব্যিক প্রত্যয়ে আমার নির্দ্বিধ প্রত্যয় থাকা একান্ত প্রয়োজন, যে-কাব্যিক প্রত্যয় হয়তো কবির ও আমার ব্যবহারিক প্রত্যয়ের সঙ্গে সুসঙ্গত অথবা হয়তো নয়। যদি কাব্যিক প্রত্যয় আমি গ্রহণ করতে অপারগ হয়ে থাকি, তা হলে তাঁর কাব্যসৃষ্টিই

আমি গ্রহণ করতে পারি নি। অতএব আমার দৃষ্টিকোণ থেকে সে-কাব্য অসার্থক। কবিতাটি তখন আর কাব্য নয়, বাণীশিল্প নয়, যে কোনো সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য বাচনিক প্রকাশ মাত্র। আমার পাটোয়ারি বুদ্ধি ও প্রত্যয় আমার কাব্যসম্ভোগে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। পক্ষান্তরে কবি নিজেও হয়তো তাঁর ব্যবহারিক চিন্তাক্ষেত্রেই আটকে গেছেন, তাঁর ভাবনা পৌঁছয়নি সৃষ্টিশীল শক্তির এলাকায়। প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে ব্যবধান মানে কাব্যের অসার্থকতা—হয়তো কবির অক্ষমতা নয়তো পাঠকের অসংবেদনা[১]। সার্থক কাব্যরসে কোনো প্রত্যয়-অসঙ্গতি থাকা অসম্ভব একথা বুঝতে না পারার দরুণ এলিয়টের মত পুরোপুরি গ্রাহ্য নয়।

৪

উপরের অনুবন্ধ থেকে দুটি তর্ক উঠতে পারে। (এক) পাঠক কাব্যদৃষ্টি সম্যক গ্রহণ করতে পারেন নি, সেজন্য কি সিদ্ধান্ত করব যে কবিতাটি অসার্থক হয়ে গেল? কবিতার কি নিজস্ব কোনো নিরিখ নেই? কাব্যের মূল্য কি যাচাই করতে হবে প্রতি পাঠকের রসগ্রহণ শক্তি দিয়ে না কোনো চিরন্তন স্বাধীন মানদণ্ড দিয়ে? (দুই) বাচনিক রূপের প্রসঙ্গ। কোনো ধারণা যখন কাব্যীভূত হয় তখন সে-ধারণা পেয়েছে বাচনিক রূপ। অপরপক্ষে, কাব্যীভূত হবার পূর্বে ধারণাটি যখন মাত্র ব্যবহারিক ধারণাই ছিল, তখনও তো তার রূপ ছিল বাচনিক। তা হলে দুই বাচনিক রূপে মস্ত প্রভেদ কোথায়?

তর্ক দুটির আলাদা আলাদা বিচার করা যাক।

প্রথম তর্ক। কাব্যের মূল্যায়নে চিরন্তন মানদণ্ড কিছু আছেই (সে-মানদণ্ডের স্বীকৃতিতে আরিস্টট্‌ল থেকে মারিত্যাঁ অবধি সব সাহিত্যশাস্ত্রীর আলোচনার ঐক্য সূত্র) কিন্তু প্রতি পাঠকের রসবোধ আদৌ অবজ্ঞেয় নয়। কবিতার সার্থকতা লক্ষ পাঠকের লক্ষ স্বতন্ত্র রসাস্বাদে, আবার কোনো না কোনো চিরন্তন আদর্শের পরিপূরণেও তার সার্থকতা। প্রত্যেক পাঠক কবিতার সম্মুখীন হন নিজ বিশিষ্ট সংবেদন ও মনোভাব নিয়ে, প্রত্যেক কবিতা পাঠে কাব্যের পুনর্বিকাশ। যত নূতন পাঠক কবিতাটি পড়ছেন তত সংখ্যক বিকাশ কবিতার, একই পাঠক যদি পুনঃপুনঃ কবিতাটি পড়েন তা হলেও কবিতার পুনঃপৌনিক বিকাশ। এই আশ্চর্য পুনর্ভব শক্তি শিল্পের অনন্য মাহাত্ম্য আর সার্থক কাব্যে এই নিয়ত-নবত্বের প্রমাণ অসংখ্য স্বতন্ত্র পাঠকের রসসম্ভোগে। সুতরাং একটি পাঠকের বেলায়ও রসাস্বাদের ব্যাঘাত ঘটলে কাব্যের পুনর্ভব শক্তি রুদ্ধ অস্পষ্টে হয়ে পড়ে, অর্থাৎ কবিতাটি অন্ততঃ সে-মুহূর্তের জন্য কাব্য হতে পারল না। রসাস্বাদের এই ব্যাঘাতের মূল কোথায়, পাঠকের অসংবেদী চিত্তে না কবিতার কোনো অসম্পূর্ণতায়, সে আবার অন্য এক প্রশ্ন, Obscurity in Poetry, কাব্যে দুরূহতা অথবা অস্পষ্টতার প্রশ্ন, যে-প্রশ্নের উত্তর বিস্তৃত প্রবন্ধের অপেক্ষার্থী। আপাততঃ কোনো সৎ সমালোচক ভুলতে পারেন না যে কাব্যের মূল্যায়ন একদিকে যেমন ক্লাসিকপন্থী হবে, অর্থাৎ চিরন্তন মানসাপেক্ষ হবে, অন্যদিকে তেমনই রোমান্টিকপন্থী হবে, অর্থাৎ প্রতিটি স্বতন্ত্র পাঠকের ব্যক্তিসত্তায় কাব্যের অভিসংঘাত কোন রূপ পরিগ্রহ করল অথবা আদৌ করল না সে-কথারও বিচার করবে। ব্যক্তির রুচি তুচ্ছ নয়।

এ-তর্কে আরো প্রশ্ন ওঠে, চিরন্তন আদর্শ কী অথবা কী কী? এ-প্রশ্নের উত্তরও ভিন্ন প্রবন্ধের বিষয়, তবুও এ স্থলে বলা প্রয়োজন (যে-কথা পূর্বেই বলেছি) যে চিরন্তন বলতে নিরবধি কাল বুঝব না, বুঝব ঐতিহাসিক বিবর্তনে অন্বিত বিশ ত্রিশ শতাব্দী মাত্র,

যে-কালে পূর্বতন যুগের ঐতিহ্যচেতনা পরবর্তী যুগের চিন্তায় এষণায় কর্মে প্রভাব বিস্তার করে। চিরন্তনের এই সংজ্ঞায় পড়ে না ক্রোমাগনন্‌ অথবা নিয়ন্‌ডারথাল্‌ মানুষের কাল—পড়তে বাধা নেই কিন্তু সে-কাল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বড়ই স্বল্প—কিন্তু মিশরীয় আসীরিয় গ্রীক চৈনিক ভারতীয় সভ্যতার দিন থেকে আজ অবধি সমগ্র মানবজাতির চিন্তায় ও ক্রিয়াকর্মে অসংখ্য ব্যবধান ও বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কিছু মূল্য পাওয়া যায় যাকে জীবনানন্দ বলেছেন "স্মরণীয় উত্তরাধিকার"। এই ইতিহাস-সীমিত স্মরণীয় উত্তরাধিকার প্রায় আড়াই হাজার বছরের। ইলিয়ড্‌ আর ঈনিড্‌, কঠোপনিষৎ আর বুক অব্‌ ইক্লিজিয়াস্‌টেস্‌, ডিভাইন্‌ কমেডি আর শাহ্‌নামা, শকুন্তলা ও কিং লীয়র্‌, ফাউস্‌ট্‌ ও আ্যানা কারেনিনা নিজ নিজ প্রকাশকালে তখনকার পাঠকের চিত্তে জাগিয়েছিল উন্মেল অনুরণন। প্রশিক্ষিত রুচিবান পাঠক আজও সে সব মহৎ সাহিত্যসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত। যদিচ আইভর্‌ রিচার্ডস্‌ "Permanence as a criterion" (চিরন্তনতার মানদণ্ড) সম্বন্ধে অবিশ্বাসী এবং মনে করেন যে "ডিভাইন্‌ কমেডি" নেহাৎই কতকগুলি বিস্মৃতপ্রায় ধারণার ভাণ্ডারমাত্র, তবুও বহু পুরুষপর্যায়ের রুচিবান পাঠক স্বীকার করেছেন (সে-স্বীকার যে কোনো critical timidityর, সমালোচনিক ভীরুতার পরিচায়ক, রিচার্ডসের এমন ধারণা ধৃষ্ট পণ্ডিতম্মন্যতা বৈ আর কিছু নয়) যে এসব সাহিত্যসৃষ্টি মানবের রসনির্মাণ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সে-নিদর্শনে আমরা চিরন্তন আদর্শের ধারণা পাই। সন্দেহ নেই যে এ-উত্তরাধিকারেও মূল্যায়নভেদ হয় কালে কালে, নিরিখ বদলায়, ইলিয়ড্‌ কেন মহৎ সে-ধারণা বদলায় কিন্তু ইলিয়ড্‌ যে মহৎ সে-ধারণা বদলায় না।

দ্বিতীয় তর্ক। ভাষা মানুষের অতি অভ্যস্ত সম্পদ, এত অভ্যস্ত যে সচরাচর আমাদের হুঁশ থাকে না যে আমরা ভাষার অধিকারী। সেজন্যই একথাও বুঝতে পারিনে কী করে ভাষার মতো অত্যন্ত মামুলি বস্তু আবার শিল্পের অন্যতম মাধ্যম। কবিতা যে শিল্প—বাক্‌শিল্প—কবিতার অঙ্গ ও উপাদান যে আমাদের নিত্য অভ্যস্ত ভাষায়, একথা মাঝে মাঝে যেন নতুন করে আবিষ্কার করি আর তখনই বুঝি যে সব বাচনিক অভিব্যক্তি সমস্তরীয় নয়, লক্ষ লক্ষ বাচনিক অভিব্যক্তি দৈনন্দিন ভাষা প্রয়োগের সৃজনেতর স্থূল রূপহীন স্তরেই থেকে যায় অথচ কচিৎ দুয়েকটি বাচনিক অভিব্যক্তি শিল্পরূপ পরিগ্রহ করে কোন্‌ অনির্দেশ্য কল্পনাশক্তির অবিশ্লেষণীয় আশীর্বাদে!

কয়েকটি কাব্যোদ্ধৃতি এবং তাদের সাধারণ গদ্যার্থ লক্ষ্য করা যাক :

তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্র-রবে।
(—রাত্রি ভোর হলেই তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে।)

The multitudinous seas incarnadine.
(—The many seas turned red.)

রোমাঞ্চিত মাঠে মাঠে
ফেটে পড়ে আশ্বিনের আশ্চর্য সকাল।
পুলকিত অরণ্যের

মন্দমুগ্ধ নীলাক্রান্ত পাখি
নিরুদ্দিষ্ট শূন্যে মেলে পাখা।
(—নতুন শস্যের মাঠে মাঠে এলো আশ্বিনের চমৎকার সকাল।
নীলপাখি বন থেকে বেরিয়ে যেন কোন্ নেশায় উড়লো আকাশে।)

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য—
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
—শ্বেতাশ্বতর, ৪।৬

(—দুটি পাখি, তারা সমভাবাপন্ন এবং সব সময় একত্রবাসী,
একই বৃক্ষকাণ্ডে আলিঙ্গিত হয়ে আছে। একটি পাখি সুস্বাদু
ফল ভক্ষণ করছে, অথচ অন্য পাখিটি নিজে না খেয়ে সাক্ষীরূপে
সঙ্গীর ভক্ষণ লক্ষ্য করছে।)

প্রতি উদ্ধৃতির জুড়ি দুটিতে বক্তব্য নির্যাস একই কিন্তু প্রথম বাক্‌সমাবেশ কাব্যগুণসম্পন্ন, শ্বিতীয়টি নয়, প্রথমটিতে কল্পনাশক্তির ও ভাষা প্রয়োগের সে-আশীর্বাদ উদ্ভাসিত যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। কাব্যভাষা ও আটপৌরে ভাষার তারতম্য সূক্ষ্মভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে অলঙ্কার শাস্ত্রে। এক পক্ষে মুখ্য অর্থ বা বাচ্যার্থ, অপরপক্ষে ব্যঙ্গার্থ বা ব্যঞ্জনা। এই ব্যঞ্জিত ধ্বনির আলোকে বাচ্যার্থ রূপায়িত হয় কবিতায়, সেজন্য ব্যঞ্জনা বা ধ্বনির নানাবিধ শ্রেণীবিশ্লেষণে আনন্দ পেতেন ভারতীয় রসবেত্তা আর অনুরূপ কারণে ইয়েয়োপীয় রেটরিকবিৎ বাক্যালঙ্কারের রকমফের বিচারে ব্যস্ত থাকতেন। কাব্যের প্রধান এবং অন্তরঙ্গতম কাজ যে অনুভূতির উদ্ভাবনা এবং ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তিতেই যে আবেগ সঞ্চার সম্ভব সে-ধারণা অবশ্য প্রাচীন কাল থেকেই সুবিজ্ঞাত আর বিশেষতঃ উনিশ শতকী রোমান্টিক ভাবধারার সঙ্গে নিবিড়-লিপ্ত তবে এযুগের সাহিত্যশাস্ত্রী মনে করেন যে কাব্য-ভাষা অলঙ্কৃত বাক্যের চেয়ে অনেক মহৎ, কাব্যভাষায় কবির বাক্‌শিল্পপ্রতিভা প্রকাশিত হয় রূপকল্প ও প্রতীকপ্রয়োগের মাধ্যমে। কাব্যে আমরা তথ্যলাভ করিনে (যদি করি সেটা ফাউ, কাব্যের স্বধর্মোৎসারিত ফল নয়), কাব্যে যে-জ্ঞানলাভ করি সে-জ্ঞান সংসারী বুদ্ধির অথবা ধীশক্তির আবেদন নয়, সে-জ্ঞান অনুভূতির জ্ঞান, এষণার প্রবৃদ্ধি। যে-মুহূর্তে আমরা কাব্যের এই বিশেষ ক্ষেত্রটির কথা ভুলে যাই, ভুলে যাই যে কাব্যোৎপন্ন জ্ঞান অনুভূতি-আবেগ-এষণার জ্ঞান, পাটোয়ারি বুদ্ধির অথবা ধীশক্তির জ্ঞান নয়, সে-মুহূর্তেই কাব্যপ্রত্যয়ের ব্যাঘাত ঘটে কেননা তখন আমরা কাব্যের বিচার করতে যাই ব্যবহারিক প্রত্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে। তখন তর্ক করব Truth is Beauty, Beauty truth একথা তো আমার সংসারী প্রত্যয়ের বলয়চক্রে আসছে না, এ কোন ধরনের কথা হল? সে-বিতর্কের আধিতে কবিতার প্রাণকেন্দ্র দৃষ্টিবহির্ভূত হয়ে যাবে। কবিতা আর কবিতা থাকবে না, যে-কোনো সাধারণ বাক্যবন্ধের সমগোত্রীয় হবে।

কাব্যোৎপন্ন অনুভূতির কথাটা আরেকটু বিশদ করা দরকার। কাব্যের অনুভূতি ও সচরাচরিক অনুভূতিতে তারতম্য না করলে কাব্যের শিল্পরূপ আমাদের হৃদয়ঙ্গম হবে না।

আমার আশঙ্কা হয় যে এ-প্রবন্ধের তৃতীয় অনুবন্ধে যে দুই প্রকার প্রত্যয়ের তারতম্য বিচার করেছি, এখন যদি আবার প্রস্তাব করি যে অনুভূতিও দুই প্রকার, তাহলে সম্ভবতঃ আমার আলোচনা অতিসূক্ষ্মতার অভিযোগে লাঞ্ছিত হবে। যতদূর জানি কোনো সাহিত্যশাস্ত্রী এ যাবৎ প্রত্যয়ের প্রকার ভেদ করেন নি, অনুভূতিরও নয় (প্রত্যয়ের ও অনুভূতির যে প্রকার ভেদ সম্বন্ধীয় ধারণার প্রস্তাব আমি এ-প্রবন্ধে করছি) কিন্তু প্রকার ভেদ ছাড়া আমাদের কাব্যসম্বন্ধীয় চিন্তা কী ভাবে পরিচ্ছন্ন ও সংগত হতে পারে তা ভেবে পাইনে। দুপ্রকার প্রত্যয়ের সপক্ষে যুক্তি পেশ করেছি এ-প্রবন্ধের তৃতীয় অনুবন্ধে। এখন বলা প্রয়োজন যে অনুভূতিও দুরকমের—লৌকিক অনুভূতি ও শৈল্পিক অনুভূতি। শিল্পের অনুভূতি-আবেগ-এষণা লৌকিক অনুভূতির সমগোত্রীয় বটে কিন্তু সমস্তরীয় নয়। এ-দুইয়ে ব্যবধান যেন কাঁচা লোহায় ও পান-দেওয়া ইস্পাতে ব্যবধান। এক্ষেত্রে অনুভূতির অ-সংস্কৃত ব্যবহারিক রূপ, অপরক্ষেত্রে শুদ্ধীভূত রূপ।

কিন্তু শুদ্ধি হয় কী ভাবে?

ইতিপূর্বে বলেছি যে কাব্যের আবেগসঞ্চারী শক্তির ধারণা সাহিত্যশাস্ত্রের পুরাতন কথা, কিন্তু সে কথা যেন নতুন গতিঝোঁক লাভ করল ওয়র্ডস্বোয়র্থের উক্তিতে : Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings—প্রবল স্বতোচ্ছল অনুভূতি-ই কাব্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ-উক্তির অসম্যক তাৎপর্যের ফলে অনেকেই বুঝলেন যে একগাদা আবেগের ছল্‌কানিতেই কাব্যের স্বধর্ম পালিত হয়। পক্ষান্তরে যাঁরা ব্যক্তিক অনুভূতির উচ্ছলতায় অতৃপ্ত তাঁরা মনে করলেন ওয়র্ডস্বোয়র্থের শস্ত পাল্টা জবাব মিলেছে এলিয়টে : Poetry is not a turning loose of emotion, it is an escape from emotion—ঢিলে-দেওয়া আবেগের অবাধ স্ফূর্তিতে কাব্য নয়, বরং আবেগ থেকে অব্যাহতিতেই কাব্য। আমার মনে হয় যে বস্তুতঃ ওয়র্ডস্বোয়র্থের ধারণায় ও এলিয়টের ধারণায় কোনো মৌলিক বৈষম্য নেই। ওয়র্ডস্বোয়র্থের উক্তি যদি তাঁর চরম কাব্যতত্ত্ব বলে মানি তাহলে তাঁর প্রতি দূরপনেয় অবিচার করা হবে কেননা তাঁর বর্ণিত স্বতোৎসারিত অনুভূতি কখনই ফেনায়িত বাক্‌স্ফীত স্বল্পসার অনুভূতি নয়, এ-অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁর অন্য উক্তিও অবিস্মরণীয় : Emotion recollected in tranquility— আত্মস্থ প্রশান্তভাবে স্মরণ-হওয়া অনুভূতি। ওয়র্ডস্বোয়র্থের tranquility কথাটি সুপ্রযুক্ত নয়, যে-মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাবার পরে অনুভূতি উন্নীত হয় কাব্যবস্তুতে, সে-পরিবর্তনের সঠিক তাৎপর্য পাওয়া যায় না এ-কথাটিতে। দার্শনিক পরিভাষার সঙ্গে ওয়র্ডস্বোয়র্থের সম্যক পরিচয় ছিল না, তাঁর চিন্তাও ছিল না ন্যায়শাস্ত্রসম্মত তবুও তাঁর ধারণাগুলি মূলতঃ সৎ। অনুভূতিই কাব্য অথচ সে-অনুভূতি আত্মস্থ স্মৃতিতে সঞ্চারিত—একথায় ওয়র্ডস্বোয়র্থ বুঝেছিলেন কাঁচা অনুভূতি নয় পাকা অনুভূতির প্রভেদ (এহেন বিশ্লেষণ যদি পাঠক বরদাস্ত করতে পারেন), অ-সংস্কৃত আবেগ ও শুদ্ধীকৃত আবেগের তারতম্য আর সে-তারতম্যই এলিয়ট জ্ঞাপন করেছেন process of depersonalization (নিজস্ব চেতনার বিলোপ)-এর ব্যাখ্যায়। আমার বিবেচনায় ওয়র্ডস্বোয়র্থ tranquility বলতে যা বুঝেছিলেন, এলিয়ট মূলতঃ তা-ই বুঝেছেন যখন তিনি বলেছেন যে the progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality (শিল্পীর অভিব্যক্তি নিরন্তর আত্মবলিতে, নিজস্বচেতনার নিরন্তর অপসরণে)। কবির প্রাক্‌সৃষ্টি আবেগ নিজস্ববোধসম্পন্ন—যে-আবেগে তিনি উদ্বেলিত সে-আবেগ একান্ত

তাঁরই, তাঁর ব্যক্তিত্বের বাইরে তার কোনো স্থান নেই—আর যতক্ষণ সে-আবেগ এককেন্দ্রিক থাকে ততক্ষণ যেন সে প্লাশভরা ঘোলাজল। যখন ঘোলাজল থিতিয়ে পরিষ্কার জল উপরে ওঠে, যখন শিল্পীচিত্তে সৃজনীপ্রক্রিয়া আবর্তিত হতে থাকে তখন সে-আবেগের নিজস্ববোধ ক্রমশঃ অপসৃত হতে থাকে (আর এ-নিজস্ববোধ নিতান্তই সঙ্কীর্ণ স্থানকালপাত্র সাপেক্ষ, নেহাৎই ভঙ্গুর), সৃষ্টিশীল চিত্তমন্থনের ফলে শিল্পীর ব্যবহারিক অনুভূতি রূপায়িত হয় শুদ্ধীভূত শৈল্পিক অনুভূতিতে। সার্থক কাব্যে হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি যেসব অনুভূতি পাই সেগুলি ও ব্যবহারিক হর্ষ বিষাদ সমার্থক নয়। কবির লৌকিক প্রত্যয়ে যেমন, তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতিতেও তেমনি সাধারণ জগতের কোনো কৌতূহল নেই, কবির শৈল্পিক প্রত্যয়ে ও তাঁর শুদ্ধীভূত অনুভূতিতে যে নিজস্ববোধরহিত মানবিক প্রত্যয় ও অনুভূতি সমুদ্ভাসিত তাতেই জগতের অনিমেষ কৌতূহল। আবেগ শুদ্ধীকরণের এই প্রক্রিয়া বোঝাবার জন্যই আরিস্‌টট্‌ল্‌ "কাথারসিস্‌" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

৫

এ-প্রবন্ধের গোড়াতে বলেছি যে প্রত্যয়সমস্যা পাঠকের সমস্যা। পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা আরেকটি কথা না বললে এ-প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকবে। এতক্ষণ সযুক্তি আলোচনা করেছি যে কাব্যের প্রত্যয় ব্যবহারিক প্রত্যয় নয় কিন্তু সে-প্রত্যয়ের শুদ্ধ বিকশিত রূপ, অর্থাৎ কাব্যের অনুভূতি সংসারী অনুভূতির সংস্কৃত প্রকাশ। এ-আলোচনা থেকে এমন সিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক যে যদিচ শিল্প ও লৌকিক জীবন এক নয় তবুও লৌকিক জীবনেই শিল্পের অচ্ছেদ্য মূল। যিনি কাব্যের সৎ পাঠক, তাঁর সংসারী প্রত্যয় ও অনুভূতি অবশ্যই ক্রমশঃ বিশুদ্ধতর হয়, তাঁর মানবিক সত্তা পূর্ণতর হয়, শিল্পজীবন ও লৌকিক জীবনের সমন্বয়ে তাঁর জীবনবোধ হয় মহত্তর। কাব্যের প্রত্যয় ও অনুভূতি যদি পাঠকের নিত্য নৈমিত্তিক লৌকিক প্রত্যয় ও অনুভূতিগুলিকে সমৃদ্ধ ও বলিষ্ঠ করতে পারে তাহলে সে-কাব্য কাব্যের চেয়েও বড়ো হবে কেননা সে-কাব্য শুধু কাব্য নয় তাকে বলব জীবনবেদ আর কাব্য তো জীবনের চেয়ে বড়ো নয়। কোটি কোটি নরনারী কাব্যে যে-আনন্দ পেয়েছে সে-আনন্দ হয়েছে তাদের প্রশস্ত জীবনবোধের সহায়ক। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় "শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি" আমাদের সহনীয় হয় এমন কি সে-জীবনযাত্রায় আমরা পেতে পারি মহৎ মানবিক সম্বোধি যদি কাব্যপ্রত্যয়ে আমরা সাহায্য পাই, অর্থাৎ কাব্যপ্রত্যয়ে ও কাব্যানুভূতিতে অভ্যস্ত হয়ে আমাদের সচরাচরিক প্রত্যয় ও অনুভূতি বিশুদ্ধ হয়। কাব্যপাঠে এ-উন্নয়ন সম্ভব বলেই ম্যাথিউ আর্নল্ড ও তাঁর পরবর্তী কেউ কেউ বলেছেন যে সমাজজীবনে ধর্মের যে উন্নয়নী কর্তব্য সে-কর্তব্য এযুগে বর্তেছে কাব্যে। এযুগে কাব্যপ্রত্যয়ের প্রশ্ন প্রবল হয়েছে তার কারণ মানুষের জীবনপ্রত্যয়ই এখন বিস্রস্ত।

আজ এই পৃথিবীর অন্ধকারে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস
কেবলি শিথিল হয়ে যায়।

সে-শিথিল বিশ্বাস বলিষ্ঠ হতে পারে সৎ কাব্যের প্রত্যয় ও আবেগসঞ্চার ক্ষমতায় আর কাব্য সৎ হতে হলে কবিকেও হতে হবে সৎ, কবির শুদ্ধ প্রত্যয়ে ও ব্যবহারিক প্রত্যয়ে থাকবে না কোনো দুস্তর ব্যবধান। তেমন সৎ কাব্যের উদাহরণ আমি পাই আমার প্রিয় কবির রচনায়। সে-কাব্যে কবির ব্যক্তিক বিশ্বাস ও শৈল্পিক প্রত্যয়, পাঠকের সংসারী বিশ্বাস

ও কাব্যপ্রত্যয়, কবির ও পাঠকের অনুভূতি, সমস্তই নির্ব্যবধান ও একাত্ম। এ যুগের "কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ, / অন্ধকার, সংকার, ব্যাজস্তুতি, ভয়, নিরালার জন্ম", যে কালে খণ্ডিত বাংলায় ও উদ্‌ভ্রান্ত পৃথিবীতে "বিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়", যে-পৃথিবীতে "ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায়", সেই শকুন্তক্রান্তির যুগে কবির প্রত্যয় বচনে আমি শুনতে পাই পরম কাব্য আবার কাব্যের চেয়েও মহত্তর উক্তি কেননা সে-কাব্য আসলে অনির্বাণ জীবনবোধের উদ্‌গীথ তান, সে-কাব্যে শিল্পপ্রত্যয় ও জীবনপ্রত্যয় সমার্থ :

মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে;
নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে;
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা-নবীনতা-শুভ্র মানবিকতার ভোর?
নচিকেতা জরাথুস্ট্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে?
অন্ধকারে ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই;
কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।
হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলি গতির গুণগান গেয়ে—সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে;
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলনসূর্যে মানবিক রণ
ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন?
নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাস ভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাটবসন্তের তরে!
সেই সব সূনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষণ্ণ হৃদয়;
জয় অস্তসূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়।

মামলা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পোকাটা দেওয়ালে
নোংরা প্রাণের ফোঁটা,
কামনার চেয়ে কড়া তেষ্টায়
মোহিনী আলোর পলকের শুধু
হবে জ্বলন্ত জার।

সরীসৃপটা ঘৃণ্য ঠাণ্ডা হিংসে
বিদ্রূপ-কশা-রসনা গুটিয়ে
ওৎ-পাতা সংহার।

কি হবে হৃদয়, কি হবে?
রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত গোণা
শেষ হবে কি পরাভবে!

পোকা টিকটিকি দুই-এর মামলা দুনিয়ায়।
কার হয়ে বল লড়বে?
কে আসামী কে যে বাদী না বুঝে-ই
কত ওকালতি করবে!

কালোয় সাদায় আলোয় ছায়ায়
নক্সা সাজাতে স্বখাত মায়ায়
কাটাকাটি ঢের করলে;

গহন গভীরে ডুব দিলে কত
তুহিন শিখরে চড়লে;
মানে তবু কিছু পেলে না।
হাঁ-এর না-এর মনগড়া আঁক
গোঁজামিল ছাড়া মেলে না।

কে জানে, বুঝি বা পোকা টিকটিকি
দুই নয়।
পর্দাটা ঠেলে উঁকি দেবে কত,
মজে-ই দেখো না অভিনয়!

আজ সে ঘুমোক

মনীশ ঘটক

সমুদ্র এখন শান্ত। জাঁহাবাজ ডানপিটে ছেলে
দিনভর দৌরাত্মির পালাশেষে যেন অবহেলে
ঘুমিয়ে পড়েছে। দু একটা পাখী ওড়ে। অল্প হাওয়ায়
আ-দিগন্ত বাঁচিভঙ্গ অনর্গল মালা গেঁথে যায়।
অনেক মনের কথা—থেকে যায় যেগুলো না বলা—
যেমন বুকের থেকে ওষ্ঠপ্রান্তে এসে দেয় দোলা—
ঠোঁটেতে কাঁপন তুলে ফের ফিরে যায় নতমুখে
ভাষাহীন হৃতবাক্ বিষণ্ন বিবর ভাঙাবুকে।

নেচে, কুঁদে, দাপাদাপি করে, মুখে তুলে তীব্র হ্রেষা,
একদিন মেতেছিল যে ঢেউয়েরা ফেন-শুভ্র-কেশা
বিষম বৈসূচনে চূর্ণ চূর্ণ করে সব বাধা,
তারা সব পাশ ফিরে শোয়। পরম প্রশান্তি সাধা-
—ঘুম এঁকে রাখে চোখে। মাঝে মাঝে স্বপ্নের দেয়ালা
রুচির চাঞ্চল্য আনে; কান্না হাসির ব্যর্থ পালা
বুদ্বুদের মত আসে যায়; ঘুম হয় গাঢ়তর।
ঢেউয়েরা কি ভুলে গেল তাদের সংহতি ভয়ংকর?

যেদিন ঈশান মেঘে ডমরু বাজাবে ভোলানাথ,
চিড় খেয়ে মহাকাশ ফাটবে শতধা অকস্মাৎ।
ঘুম ভেঙে সেই দিন সব ঢেউ এক সাথে উঠে
সংহার আরাবে নেবে সমুদ্রের শান্তি স্বপ্ন লুটে।
জেগে উঠে সমুদ্র বিক্ষুব্ধ আক্রোশে আচম্বিতে
উল্লম্ফনে দ্যুলোকের প্রান্ত ছোঁবে অতি অতর্কিতে
দুর্নিবার ঘূর্ণীবায়ে প্রলয়-প্লাবন হুহুংকারে।
আজ সে ঘুমোক। আজ কাজ নেই ডাক দিয়ে তারে॥

হাস্‌লে যে টোল পড়ে গালে

মনীশ ঘটক

বাঁ হাতেতে জড়ানো কাঁখাল,
ডান হাতে ধরা বাম স্তন,
চুমোয় চুমোয় ভরে গাল,
কাঁপে ভুরু, কিসের কাঙাল?

ঊর্ণাজাল কেশপাশ ঘন
নামে ঘিরি নিতম্ব বিশাল;
জঙ্ঘা রচে ব্যূহ শত্রুহন,
ঊর্ধ্বে গ্রীবা, বিজয় তোরণ।

বিজয়িনী, বিজিতে ঠকালে।
কুন্দ দন্তে বিজড়িত বিভা,
হাস্‌লে যে টোল পড়ে গালে,
জোড়া ভুরু কেন যে বাঁকালে!

উল্লাসলালসা অস্তমিতা,
তবু কেন টোল পড়ে গালে?
বীতবহ্নি, স্ফুলিঙ্গ দীপিতা
জ্বালালে কী শিখা বিদ্যুন্নিভা!

বিজয়িনী, তোমারি যে হার,
ধরা দিলে অন্তরে আমার!

চার স্রোত

বিষ্ণু দে

এখনও গরম কম, ফাল্গুনের শেষ;
পল্লবে মুকুলে ফুলে চোখ ভরে, ঘ্রাণ ভরে;
আর পাখী, শত পাখী গান করে।
অসহায় আর হিংস্র জন্তুজগতেও জাগে প্রকৃতির দেশজ আবেশ।
চড়া, বালি, ছোট বড় শাদা কালো শিলা
চতুর্দিকে ইতস্তত জ্বলে বাসন্তীর অনুরাগে;
তার মধ্যে নয়নাভিরাম হিম স্বচ্ছ স্রোত।
পায়ে চলা পথ বাঁয়ে রেখে
ডাইনে বাঘোয়া টিলা ফেলে নেমে চলি জলে জলে,
স্ফটিক শীতল জলে স্পর্শের আরামে নেমে নেমে চলি অবিরত।

ছড়ায় নদীর বাহু সমস্ত শরীর,
পাহাড়ে মাটির পাড় ঘিরে থাকে বিপুল বিস্তারে
অতিকায় নর্তকের মতো।
কানে আসে গভীর সংগীত।
চার স্রোতে ভাঙে নদী শিলায় শিলায়,
বিবাদীর ধ্বনি মেলে আত্মদানে প্রেমের নিস্তারে,
ঝাঁপ দেয় প্রবল ঝোরায় প্রপাতের বেগে চারটি ধারায়;
নিচে, বেশ দশ-বারো হাত নিচু স্তরে
তরল তন্ত্রীর ভিন্ন চারটি পরদায়
অপরূপ সংগীতে ঝঙ্কারায়,
স্বাতন্ত্র্য মিলায় যেন মৎসার্টের বরদা প্রসাদে,
একটি সংহতি পায় মধুর তরল নানা খাদে হরেক নিখাদে।

সুরেলা ঝোরায় ঢালি নিজেকেও,
গানে স্নানে ফেনিল ঊর্মিল তোড়ে ছেড়ে দিই,
ধুয়ে দিই শরীর, ডোবাই ফাল্গুনের শেষাশেষি সমস্ত সংবিত।

রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে

—ঋগ্বেদ ১০/১২৭/৮

বিষ্ণু দে

দিনকে ভয়, রাত্রি শুধু স্বাধীন,
অন্ধকারে চেতনা চোখ তোলে
ঘুমের মাঠে, যেখানে নীলাকাশে
কালের মেলা, শিশুরা ঘুম খেলে;
ঘরে ফেরার সান্ধ্য হিল্লোলে
নদীর পাড়ে শিশিরজাগা ঘাসে
জোনাকি জ্বালে স্বপ্ন-নীল দিন।

এখনও দিন ভয়ঙ্কর দিন,
পরের দিন, দাসের প্রতিদিন,
চোখ কানের—সব ইন্দ্রিয়ের
শহীদ দিন, শ্রেয়ের আর প্রেয়ের
প্রাত্যহিক অপঘাতের হীন
কুশ্রী মূঢ় লুব্ধ প্রতিদিন;
দিনের হাতে সুন্দরের প্রিয়ের
মুক্তি নেই, আশাও আজ ক্ষীণ।

রাত্রি শুধু বিরাটে আর গভীরে
প্রাণের তীরে তমসাস্রোতে স্নানে
পুণ্য করে পূর্ণ করে মন,
সদ্য শুচি চেতনা ওঠে ধীরে,
আঁচলে আঁকে তারার দীপাবলী;
আগামী কাল শিশুর শতগানে
স্বপ্নে ঢাকে গ্রাম শহরতলী,
শহরে তোলে মুক্ত উপবন।
দিনকে ভয়, দিনেই চোরাগলি।
দিনের আগে রাত্রি চাই প্রাণে॥

ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার জমিদারেরা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে পার্লামেণ্টের কাছে তাঁদের আর্জি পাঠালেন। সেই আর্জি এখানকার কাগজে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই মাসের "বেঙ্গল হরকরা"-তে এই আর্জির সম্বন্ধে একটি চিঠি বের হল। পত্রলেখক হচ্ছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। দেখা যাচ্ছে দ্বারকানাথ নাছোড়বান্দা। স্বয়ং জমিদার হয়েও জমিদারদের তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে দিলেন না। ইতিহাস এই রসিকতাটুকু করে চলে—শ্রেণীর কায়েমি স্বার্থের মুঠো ফুটো করে দেয় সেই শ্রেণীর ঐতিহাসিক-দৃষ্টিসম্পন্ন লোকই।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ নিম্নলিখিত চিঠিখানি ছাপা হোলো "বেঙ্গল হরকরা" পত্রিকায়।

To The Editor of Bengal Harkara and Chronicle.

SIR,

The Editor of the Bull speaks with surprise of a Native Landholder having manifested a wish "to introduce foreigners and strangers into his country". I must therefore refer the Editor to the pages of history, and assure him for his consolation, that no native landholder ever invited foreigners and strangers to visit his land and settle there. But that it was foreigners and strangers that first made their appearance in the country and have gradually established themselves as the sole rulers of this vast empire, inviting their fellow countrymen to follow them and engage in commerce and other honest persuits.

Now the question is whether these foreigners and strangers have proved so obnoxious to the native inhabitants and so injurious to their interests as to justify the latter in regarding the former with enmity and shunning concord and union with them or whether these foreigners have been found friendly and beneficial to the native community and instrumental in improving their condition. To come to a conclusion on this point by means of experience, let us next direct our enquiry to the mutual relation existing between those foreigners and the natives residing in Calcutta, where a vast number of foreigners of all ranks and descriptions, whom the John Bull represents as "Monsters", are permitted to reside, to trade, to purchase and keep up intercourse with the native population and where both equally enjoy the protection of British law.

We find in Calcutta seminaries principally established and supported by foreigners and strangers for the education of native youths both in English and Bengalee. Several of these foreigners not only give their contributions for the purpose of diffusing knowledge among the natives, but bestow their labour also gratuitously in promoting education. We find here hundreds of natives of wealth and influence well-informed and less prejudiced chiefly owing to their intercourse with foreigners and strangers, so that they feel no disgrace or reluctance in following the foreigners in laying out gardens, building houses and furnishing them. . . . Foreign neighbours scorn at the idea of "trampling down ryots" or such as are placed under them as their dependents. Again we find in Calcutta thousands of men of the middling classes raised to a degree of independence from the patronage of foreigners and strangers, enjoying liberty of thought and education. We daily have an opportunity of observing here that many thousands of men of the lower classes, commonly called ryots, are comfortably lodged and decently clothed under the protection and support of foreigners and strangers, without proving offensive to their superiors or manifesting a desire "to oppose their hereditary landlords".

In appearance, in dress, and in the enjoyment of comfort, they in general excel the sons and relations of those petty landholders that reside in the country where these foreigners and strangers are forbidden to settle; and where, in consequence, nothing but ignorance, superstition and poverty prevail.

Let any person endowed with common sense and common honesty associate and communicate both with the native inhabitants of Calcutta and those that reside in the country, and compare the intellectual, social and domestic condition of the one with the other (Italics mine—S. T.) and state publicly, whether he considers me justified in saying, that "whosoever is disposed to oppose the unrestricted residence of Europeans in this country, *provided certain changes shall at the same time be introduced into the system of administering justice* (Italics mine—S. T.) is an enemy to the natives and to their rising and future generations." It is now left with the Editor of the Bull to show and substantiate the contrary, *viz.*, that these foreigners have proved obnoxious to the native inhabitants and injurious to their interests. Should he succeed in the attempt,

I shall give up the position.

March 8, 1829.

I am, Sir, your obedient servant,
A Landholder.

এই চিঠি প্রমাণ করে যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ঐতিহাসিকদৃষ্টিসম্পন্ন দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ। প্রথমেই তিনি 'জন্‌বুল্‌'-এর ভারতবর্ষীয়-প্রীতির ভাণ ও দ্বারকানাথকে ইংরেজ-ভক্ত প্রমাণ করবার অপচেষ্টা—এই দুটি ভণ্ডামিকে ভূমিস্মাৎ করে দিয়েছেন। তিনি কিম্বা অন্য কোনো জমিদার যে ইংরেজদের এদেশে আনেননি, তারা যে নিজেরাই লাভের আশায়, ব্যবসার খাতিরে এদেশে এসে জুড়ে বসেছে সে কথা দ্বারকানাথ "জন্‌বুল্‌"-কে যত্নসই করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তার পরে শিক্ষার বিস্তারে এই বিদেশী আগন্তুকেরা যে কতো কাজ করছেন, তার ফলে দেশের যে কতো উপকার সাধন করা হচ্ছে সেটিও দ্বারকানাথ সরল শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও যে ভারতীয়েরা এই বিদেশীদের কাছ থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করছেন সেটিও তিনি জানিয়ে দিলেন।

তার পরে দ্বারকানাথ আরো গোড়া-ঘেঁসা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাজার হাজার লোকেরা ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে চিন্তার ও শিক্ষার স্বাধীনতার রসাস্বাদন করতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, যে সব চাষীরা এই বিদেশীদের সংস্পর্শে এসেছে, তাদের কাজে নিযুক্ত হয়েছে, তারা অন্য চাষীদের চেয়ে খাওয়া-পরা থাকায় অনেক ভালো অবস্থায় আছে। তাই দ্বারকানাথ দৃপ্ত ও দ্বিধাশূন্য ভাবে বলেছেন—"যে কোনো সহজবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যার সততা আছে সে কলিকাতার ও গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের সঙ্গে মিশে তাদের শিক্ষা-বিষয়ক ও সামাজিক ও ঘরোয়া অবস্থার তুলনা করে দেখুক। তার পরে সে সর্বসাধারণের সামনে খোলাখুলি ভাবে ঘোষণা করুক যে আমার এই মন্তব্য যে, যারা এদেশে ইয়োরোপীদের অবাধ বসবাসের বিরুদ্ধে, অবিশ্যি সে বসবাস বিচার সম্বন্ধীয় কতকগুলি পরিবর্তন সাপেক্ষ, তারা এদেশের বর্তমান বাসিন্দাদের ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের শত্রু—সেই মন্তব্য যথার্থ কিনা।" বিচারসম্বন্ধীয় ব্যাপারে ভারতীয়দের ও ইয়োরোপীয়দের মধ্যে যে পক্ষপাতদুষ্ট পার্থক্য করা হোতো, সেই পার্থক্য দূর করে তবে ইয়োরোপীয়দের এ দেশে বাস করতে দেওয়া যেতে পারে—এই ছিলো দ্বারকানাথের মত। ভারতীয়েরা ও ইয়োরোপীয়েরা এক আইনের আওতায় আসুক এই ছিলো দ্বারকানাথের সুস্পষ্ট অভিমত। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য হতে হয় তাঁর দূরদৃষ্টি দেখে। দেশের লোক শিক্ষাহীন, অসাড় জড়ত্বের মধ্যে তারা পড়ে ছিলো। যদি তাদের জীবনে নতুনত্বের স্পন্দন আনতে হয়, তাদের এই জড়তা দূর করতে হয়, তাহোলে ভারতবর্ষের তৎকালীন বিশেষ অবস্থায় ইয়োরোপীয়দের সংস্পর্শ ছাড়া যে সে জড়তা দূর করবার অন্য কোনো উপায় ছিলো না সেটি দ্বারকানাথ নিঃসংশয় ভাবে বুঝেছিলেন। তাই অবুঝদের নিন্দে আর স্বার্থান্বেষীদের মিথ্যে অপপ্রচার, সব তুচ্ছ করে, তিনি অবাধ-বাণিজ্য-নীতির প্রবর্তন ও ইংরেজদের গ্রামাঞ্চলে বসবাসের সুযোগ দান সমর্থন করেছিলেন। তার ফলে যে অনেক লোকের জীবিকা-উপার্জন পথ বন্ধ হয়ে যাবে এবং অনেক গ্রাম্য কুটীর-শিল্প ধ্বংস হবে তা' দ্বারকানাথ জানতেন। কিন্তু কবে কোন পরিবর্তন ঘটেছে ব্যাহীন ভাবে? কিছু লোকদের অসুবিধে করেই ইতিহাস তার পরিবর্তনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যায়।

ক্যাপিটালিজমের সম্প্রসারণের সময়ে যান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর প্রবর্তন কুটীর-শিল্পের ভগ্ন-স্তূপের উপর দিয়েই এগিয়ে গেছে সব দেশে। ইতিহাস আর যাই করুক বোষ্টমী করে না। দ্বারকানাথ নিঃসন্দেহে সেটা বুঝেছিলেন।

এই ভাবে যখন বাদবিতণ্ডা বেশ জমে উঠেছে তখন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে লর্ড বেনটিঙ্ক নিম্ন-উদ্ধৃত রিপোর্টটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের কাছে পাঠালেন :—

"We need not, I imagine, use any laboured argument to prove that it would be infinitely advantageous for India to borrow largely in arts and knowledge from England. The Legislature has expressly declared the truth : its acknowledgment is implied in the daily acts and profession of Government, and in all the efforts of humane individuals and societies for the education of the people. Nor will it, I conceive, be doubted that the diffusion of useful knowledge, and its application to the arts and business of life, must be comparatively tardy, unless we add to precept the example of Europeans, mingling familiarly with the natives in the course of their profession, and practically demonstrating by daily recurring evidence the nature and value of the principles we desire to inculcate, and of the plans we seek them to have adopted. It seems to be almost equally plain, that independently of their influencing the native community in this way, various and important national advantages will result from there being a considerable body of our countrymen, and their descendants, settled in the country. To question it is to deny the superiority which has gained us the dominion of India: it is to doubt whether national character has any effect on national wealth, strength and good government: it is to hold as nothing community of language, sentiment and interest, between the Government and the governed: it is to disregard the evidence afforded by every corner of the globe in which the British flag is hoisted: it is to tell our merchants and our manufacturers that the habits of a people go for nothing in creating a market, and that enterprise, skill and capital and the credit which creates capital, are of no avail in the production of commodities.

It is possible, however, that the actual condition of things may be regarded by many as sufficiently satisfactory to render questionable the wisdom of any great change, of which the effects are not precisely anticipated; and probably the effects of the measure of giving facility to Europeans to settle in the interior with permission

to hold land, may be more generally considered to involve so much hazard of evil as to counterbalance its admitted advantages. Now what is the actual state of the country? Is it not true that the great body of the people is wretchedly poor and ignorant? Do we not every day perceive how little our officers possess the knowledge necessary to their good government, and how much there is wanting between them that community of sentiment and purpose, without which there can be no good government? Are not the files of our civil courts loaded with arrears of business? Does there not prevail so much lying and litigation as to prove either great defects in our tribunals, or a lamentable demoralisation in the people, or more truly both? Is it not generally considered to be impossible, without a burdensome stipendiary police (almost as strange to the people as ourselves), to contrive the means of preventing the organisation of gangs of plunderers, such as once spread terror through many of our districts? Do not the police establishments, which, chiefly from the want of courage and concord in our native subjects, are thus thought necessary for the prevention of crime, lord it oppressively over the communities of whom they ought to be the aids and instruments? Are not the native officers in all departments alleged to be guilty of much extortion and corruption? Do not the Zemindars and revenue-farmers often cruelly grind the cultivators? Do not several revolting and brutalizing practices still prevail among the people? Is there anywhere the prospect of our obtaining in a season of exigency, that co-operation which a community, not avowedly hostile, ought to afford to its rulers? Is it not rather true that we are the objects of dislike to the bulk of those classes who possess the influence, courage, and vigour of character which would enable them to aid us? Do our institutions contain the seeds of self-improvement? Has it not rather been found that our difficulties increase with length of possession? In the midst of financial embarassment, are we not constantly called upon for new establishments involving fresh burdens? Is not the agriculture of the country, in most places, conducted with a beggarly stock and without skill or enterprise? Are not its manufacturers generally in a degraded condition? Is not commercial intercourse spiritless and ill-informed? Is there a single article of produce, excepting those which Europeans have improved, that is not much inferior to the

similar productions of other countries, and can the difference be traced to circumstances of soil and climate? One great staple manufacture being supplanted, is there not reasonable ground to apprehend a failure in the means of affecting the returns, without which no profitable trade can exist, especially in a country tributary to another, as India is to England? Do not the cultivators and manufacturers and merchants alike labour under an oppressive rate of interest, which, with a languid condition of trade, unequivocally evinces poverty and want of credit? Is there not, as indicated in Sir Charles Metcalfe's Minute, imminent danger of our failing to realize the income which is necessary to maintain the establishments required for the protection and good government of the country, to say nothing of roads, canals, seminaries, and public improvements of every kind?

The answers to these questions must, I apprehend, be such as to imply that the present condition of things is far from being that with which we could justifiably sit down contented. They must equally, I am satisfied, if rendered in full sincerity and truth, evince that the required improvement can only be sought through the more extensive settlement of European British subjects, and their free admission to the possession of landed property.

No stronger argument can be adduced in favour of the present proposition than is exhibited by the efforts which European skill and machinery have produced against the prosperity of India. In the last despatch in the commercial department from the India House, dated 3rd September, 1828, the Court declare that they are at last obliged to abandon the only remaining portion of the trade in cotton manufactures, both in Bengal and Madras, because through the intervention of power-looms the British goods have a decided advantage in quality and in price. Cotton piece-goods, for so many ages the staple manufacture of India, seem thus for ever lost. The Dacca muslins, celebrated over the whole world for their beauty and fineness, are also annihilated from the same cause ; nor is the silk trade likely long to escape equal ruin. In the same despatch the Court describe the great depression of price which this article sustained in consequence of the diminished cost of the low material in England, and of the rivalry of British silk handkerchiefs. The sympathy of the Court is deeply excited by the Report of the Board

of Trade, exhibiting the gloomy picture of the effects of a commercial revolution, productive of so much present suffering to numerous classes in India, and hardly to be paralled in the history of commerce.

If all the ancient articles of the manufacturing produce of India are swept away, and no new ones created to supply this vacuum on the exports, how will it be possible for commerce to be carried on, and how can any remittances on private or public account be made to Europe? If bullion alone is to supply the balance, soon will the time arrive, when, under the increased value that scarcity must give to money, it will no longer be possible to realize the revenue at its present nominal amount. It is therefore the bounded duty of Government to neglect no means which may call forth the vast productive powers of the country, now lying inert from the want of adequate encouragement. It may be confidently asked, whether to the natives singly we may look for success, and whether any great improvement has been ever introduced not exclusively due to European skill.

To those who so feelingly deplore the misery of the Indian manufacturer, it will be consolatory to know that a prospect exists of better days with a hope also that her staple commodity, the cotton manufacture, may still be rescued from annihilation. Mr. Patrick, an "Englishman", is at this moment erecting a very large manufactory for the spinning of cotton-twist by machinery, to be moved by steam ; and it is not irrelevant from the object of the present paper to observe, that these great works are erecting upon his own estate, held in fee—simple, under a grant from Warren Hastings. Hitherto the Bengal cotton has been held unfit for conversion into twist, but an improved kind has been lately cultivated, which it is supposed will be quite fit for the purpose. An improved species of tobacco has also been grown, bearing double the value of the native tobacco, and likely to vie with that of America. To whom again is the commerce of India indebted for these new resources in her commercial distress? To Englishmen only, is the triumphant answer. Specimens of both these articles have been sent to the Vice-president of the Board of Trade.

As to the practical effect, much must of course depend on the circumstances, character and conduct of the persons who might settle in the country. Let us then consider how far, on this head,

there is any just ground of apprehension. It has been supposed that many of the indigo planters resident in the interior have misconducted themselves, acting oppressively towards the natives, and with violence and outrage towards each other. Had the case been so, I must still have thought it just to make large allowances for the peculiar position in which they stand. They have been driven to evasion, which has rendered it difficult for them to establish their just claims by legal means, or they have had to procure the plant required by them through a system of advances, which in all branches of trade is known to occasion much embarrassment, and to lead to much fraud. They have possessed no sufficient means of preventing the encroachment of rival establishments, still less of recovering their dues from needy and impoverished ryots. Further, we must not forget that the restrictions imposed upon the resort of Europeans to this country have operated to compel the houses of business often to employ persons in the management of their concerns in the interior whom they would not have employed if they had had a wider scope of choice. It would not be wonderful if abuses should be founded to have prevailed under such circumstances, as if the weakness of the law should have sometimes led to violence in the assertion of real or supposed rights. But under all the above circumstances of disadvantage, the result of my enquiries is, a firm persuasion (contrary to the conclusions I had previously been disposed to draw) that the occasional misconduct of the planters is as nothing when contrasted with the sum of good they have diffused around them. In this as in other cases, the exceptions have so attracted attention, as to be mistaken for a fair index of the general course of things. Breaches of the peace being necessarily brought to public notice, the individual instances of misconduct appear under the most aggravated colours, but the numerous nameless acts, by which the prudent and the orderly, while quietly pursuing their own interests, have contributed to the national wealth, and to the comfort of those around them, are unnoticed or unknown. I am assured that much of the agricultural improvement which many of our districts exhibit may be directly traced to the indigo planters therein settled, and that as a general truth it may be stated (with the exceptions which, in morals, all general truths require to be made), that every factory is in its degree the centre of a circle of improvement,

raising the persons employed in it, and the inhabitants of the immediate vicinity, above the general level. The benefit in the individual cases may not be considerable, but it seems to be sufficient to show what might be hoped from a more liberal and enlightened system.

Without adverting to the difficulty of transporting any large number of labourer to so distant a country, India, I may remark, offers no advantage to the European who has only his labour to bring to market. In providing himself with the comforts necessary to his existence, he must here expend a sum that would much more than purchase an equivalent of native labour ; and the comparative value of the latter must increase with improved skill and knowledge.

In agriculture, the chief branch of national industry, and that on which the population mainly depends, it is impossible to economise labour to the same extent as in manufactures ; especially where a tropic sun and periodical rains exert so powerful an effect on the vegetable world. And the climate must, in almost all our districts, confine the European husbandman to the work of general superintendence. In all branches of industry, indeed, it is European capital, skill and example which India requires, and for which she offers a market. European labour is not wanted, and could not be maintained. The settlers therefore must be men of capital and skill. They must consequently be few in number, contrasted with the population of the country. A labouring class who should attempt to settle would perish. There is no scope for wild adventure. The acquisitions of the settlers must be made in the face of an established Government, and under fixed laws. Wealth can be found only by industry working with superior skill or superior credit.

W. C. Bentinck.

ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরদের কাছে প্রেরিত লর্ড বেন্টিংক-এর এই রিপোর্টটি বিশেষভাবে তলিয়ে বোঝা দরকার। লর্ড বেন্টিংক অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সমর্থক ও ইয়োরোপীয়দের এদেশে বসবাসের পক্ষপাতী। তাঁর মতের সমর্থনে তিনি যে যুক্তিগুলি পেশ করেছিলেন কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরদের কাছে তাতে ইংরেজদের এদেশে বসবাসের যৌক্তিকতার সমর্থনে তিনি দেখিয়েছিলেন যে প্রথমত যে এদেশের লোকদের শিক্ষার জন্যে এটার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এদেশে জ্ঞান কখনো শিল্প-ক্ষেত্রে ও জীবনের অন্যক্ষেত্রে যথেষ্টভাবে কার্যকরী হবে না যদি ইয়োরোপীয়রা তাদের আচরণ ও কাজ করবার ধরন প্রাত্যহিক জীবনের কাজে ভারতীয়দের সামনে ধরে না দেয়। নিজেদের কাজের উদাহরণ দিয়েই এদের মধ্যে পরিবর্তন আনা যেতে পারে, আর সেটি সম্ভব হতে পারে তখনি যখন

ইয়োরোপীয়রা এদেশে বসবাস করছে। দ্বিতীয়ত, ইয়োরোপীয়দের এ দেশের গ্রামাঞ্চলে বাসের আর একটা উপকারিতা আছে। আমাদের আফিসারেরা অপদার্থ, পুলিশ ঘুসখোর, জমিদারেরা চাষীদের পিষে-মারবার যন্ত্রস্বরূপ। বিপদের সময় এদের উপর একেবারেই নির্ভর করা যায় না। ইয়োরোপীয়েরা দেশময় ছড়িয়ে বাস করলে তাদের উপর নির্ভর করা যাবে। তৃতীয়ত কৃষি-কার্য সেই পুরাতন প্রণালীতেই চলছে। ব্যবসা চলছে ঢিকিয়ে, কোনো তাগদ্ নেই তার। ভীষণ সুদের হারে ও দারিদ্র্যে দেশ নুয়ে পড়েছে। কি করে এই সব দূর করে এই দেশকে শিক্ষায়, ব্যবসায় বাণিজ্যে, রাস্তাঘাট তৈরী ব্যাপারে ও খালকাটা ব্যাপারে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে? এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে ইয়োরোপীয়দের জমিজমা কেনবার অধিকার দিয়ে এ দেশে বসবাস করতে দেওয়া। চতুর্থত এদেশে যে বিপুল উৎপাদন-শক্তি সুপ্ত রয়েছে তাকে যদি সম্যক ভাবে জাগাতে হয় ও কাজে লাগাতে হয় তো সেটা ইয়োরোপীয়দের সাহায্য ছাড়া এদেশবাসীদের পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। মিঃ প্যাটিক, একজন ইংরেজ, তাঁর জমিদারীতে প্রকাণ্ড কারখানা বসাচ্ছেন কলদিয়ে সুতো তৈরীর জন্যে। ভালো জাতের তামাকও উৎপন্ন করা হয়েছে ইয়োরোপীয়দের দ্বারা।

এদেশে ইয়োরোপীয়দের জমিজমা কিনে বসবাস করতে দেওয়ার সমর্থনে এই যুক্তিগুলি দেখিয়ে লর্ড বেন্টিংক গ্রামাঞ্চলে চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সম্বন্ধে রঙ-বেরঙের যে সব খবর তখন বের হচ্ছিল সংবাদপত্রে সেগুলির যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ধরনের অত্যাচার যে ঘটেছে সেটা তিনি আদবেই অস্বীকার করেন নি। শুধু কয়েকটি ঘটনা থেকে সব নীলকর সাহেবদের একই দোষে দোষী বলে সাব্যস্ত করা যে যুক্তিযুক্ত নয় সেকথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন—"যে অবস্থায় অত্যাচার হয়েছে, আইন ভঙ্গ করা হয়েছে, সেই অবস্থায় এ সব না ঘটলেই আশ্চর্য হতুম। কিন্তু সে সব অসুবিধে সত্ত্বেও আমার অনুসন্ধানের ফলে আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে নীলকরেরা যে উপকার চারিদিকে বিস্তার করেছে তার তুলনায় তাদের কদাচিৎ দুর্ব্যবহার ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। যেমন অন্যক্ষেত্রে তেমনি এক্ষেত্রেও বিরল ঘটনাগুলিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যার ফলে এই বিরল ঘটনাগুলিকে সাধারণ ঘটনার নমুনা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। শান্তি ভঙ্গের উদাহরণগুলি জনসাধারণের সামনে ধরে দেওয়া হয়েছে, কতকগুলি ব্যক্তির দুর্ব্যবহার খুব বাড়িয়ে রঙচঙ করে দেখান হয়েছে, কিন্তু অসংখ্য অজ্ঞাত কর্ম যা দিয়ে শান্তিকামী ধীর ও স্থির লোকেরা জাতীয় ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে ও আশপাশের লোকদের কল্যাণসাধন করেছে, সেগুলি অজ্ঞাত থেকে গেছে। কৃষি-ব্যাপারে জেলাগুলিতে যা উন্নতি সাধিত হয়েছে তার বেশীর ভাগই সেখানকার নীলকরদের দ্বারা সাধিত হয়েছে। সাধারণভাবে একথা সত্য বলে বলা যেতে পারে যে প্রত্যেক নীল-কারখানা উন্নতির কেন্দ্র। যে সব লোক নীলের কারখানায় কাজ করে তাদের ও আশপাশের লোকদের উন্নতি সাধন করে নীলের কারখানা।"

এই লাইনগুলি দ্বারকানাথ ঠাকুরকে স্মরণ করায়। লর্ড বেন্টিংকের অনেক আগে থেকেই দ্বারকানাথ নীলকর সাহেবদের দ্বারা গ্রামের চাষীদের কি কল্যাণ সাধিত হয়েছে সে কথা পত্রিকা মারফৎ দেশবাসীদের জানিয়েছেন। দ্বারকানাথের সঙ্গে লর্ড বেন্টিংকের বন্ধুত্ব ছিলো। এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সব ব্যাপারেই বেন্টিংক রামমোহন রায়ের ও দ্বারকানাথের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ১৮৪২ খৃস্টাব্দের ৯ই অক্টোবর লেডী বেন্টিংক দ্বারকানাথকে যে চিঠি লেখেন তাতে লেখেন :

"The part you have taken in bringing about a measure on

which the mind and heart of your former Governor-General were so intently fixed, I have much pleasure in stating that, among the Native community of Calcutta, the late Rammohan Roy and yourself were the persons who took the warmest interest, and afforded the most important information, etc., etc."

—তাই গ্রামাঞ্চলে নীলকুটির পত্তন হওয়াতে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেটা বেন্টিংক নিশ্চয়ই দ্বারকানাথের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে দ্বারকানাথের উক্তিগুলির সঙ্গে বেন্টিংকের মন্তব্যের আশ্চর্য সাদৃশ্য সেইটেই প্রমাণ করে।

ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে বসবাসের বিরুদ্ধে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথাই সেদিন বিপক্ষ দলের সবচেয়ে বড়ো যুক্তি ছিলো। সে যুক্তি যে অত্যাচারের অতিরঞ্জিত কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত ও যেখানে যেখানে নীলের কারখানা বসেছে সেখানকার চাষীরা যে নীলের চাষ নেই এমন সব এলাকার চাষীদের চেয়ে অর্থনৈতিক অবস্থায় অনেক উন্নত সেই তথ্যটি ইয়োরোপীয়দের জমি কেনার ও গ্রামাঞ্চলে বসবাসের বিরোধী বাংলার জমিদারেরা একেবারে চেপে গিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ ও বেন্টিংক এদের সেই অসাধু প্রয়াস ব্যর্থ করে দিলেন প্রকৃত অবস্থার কথা জনসাধারণের সামনে হাজির করে। তারপরে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন বেন্টিংক তাঁর রিপোর্টে। কোন ইয়োরোপীয়দের তিনি ভারতবর্ষে বসবাস করতে দিতে চান? ইংরেজ মজুর ও চাষী দলে দলে এসে এদেশে বসবাস করুক এইটেই কি তিনি চাচ্ছিলেন? লর্ড বেন্টিংক সেটা আদবেই চান নি। তাঁর রিপোর্টে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, "ইয়োরোপীয় মজুর শ্রেণীর লোকদের চাই না। যারা এখানে বসবাস করতে আসবে তারা মূলধনের মালিক হবে আর তাদের কর্মকুশলতা থাকবে। এদেশের লোকের তুলনায় তারা তাই সংখ্যায় অল্প হবে।"

তাঁর উদ্দেশ্যটি জ্বল্‌জ্বল্‌ করে ফুটে বের হচ্ছে এই কথাগুলি থেকে। ইয়োরোপীয়দের মূলধনের ও কর্মকুশলতার সাহায্যে এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সংকীর্ণ পরিধি ভেঙে দিয়ে নতুন অর্থনৈতিক শক্তি সৃষ্টি করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। বেন্টিংকের দুই বন্ধু—রামমোহন ও দ্বারকানাথ—তাঁদেরও এই একই উদ্দেশ্য ছিলো। জমিদারী ব্যবস্থার কঠিন বাঁধনে-বাঁধা চাষীদের জীবনে অর্থনৈতিক উন্নতির কোনই সম্ভাবনা ছিলো না। সেই বাঁধন কাটবার জন্যে মূলধন-ওয়ালা কর্মকুশলী কিছু ইয়োরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে বাস করে নতুন নতুন ফসলের চাষের সূত্রপাত করা ছাড়া সেদিনের রাজনৈতিক অবস্থায় আর অন্য কোনো পথ ছিলো না। রামমোহন, দ্বারকানাথ ও বেন্টিংক, এই তিনজনেরই উদ্দেশ্য ছিলো তাই—জমিদারী প্রথার বাঁধ-দেওয়া গ্রামের বদ্ধ জলে নতুন অর্থনৈতিক জোয়ার বইয়ে দেওয়া। এই জোয়ার বইলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হবে গ্রামে এ বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন। রামমোহন ও দ্বারকানাথ এঁদের দুজনের মধ্যে কেহই অগুন্তি ইয়োরোপীয়দের এই দেশে বসবাস চান নি। অন্য সব বিষয়ের মতো এ বিষয়েও এঁদের বন্ধু বেন্টিংক এঁদের মতামত জেনে তাঁর মত পেশ করে থাকবেন কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরদের কাছে।

মে মাসের শেষে বেন্টিংকের এই রিপোর্ট গেলো ইংলণ্ডে কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরদের কাছে, তার বারো-তেরো দিন পরেই ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে ও ইয়োরাপীয়দের এদেশে বসবাস-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন প্রকাশিত হোলো "বেঙ্গল হেরল্ড" পত্রিকায়। প্রবন্ধটি তথ্যপূর্ণ, তাই মূল্যবান। তখনকার অবস্থা বুঝতে এটি

সাহায্য করে। প্রবন্ধটি এই—

Colonization is one of the most likely means for the Civilization of India—Sir John Malcolm.

There can be little doubt that the increase of wealth in Calcutta, and throughout Bengal, has been rapid within the last few years, and we are naturally led to enquire the reason thereof.

The value of land may be assigned as the more immediate and the lesser restrictions on commerce and greater introduction of Europeans, as the primary cause of this beneficial change. Many facts may be brought forward to strengthen each of these assertions, and, as they speak for themselves, need no preface. Land has been purchased in Calcutta thirty years ago for fifteen rupees, now it is worth, and would sell for three hundred rupees!! Many similar examples might be adduced. *By means of this territorial value, a class of society has sprung into existence, that were before unknown; these are placed between the aristocracy and the poor, and are daily forming a most influential class.* (Italics mine—S.T.). Previous to their formation, the wealth of the country was in the hands of a few individuals, while all others were dependent on them, and the bulk of the people were in a state of abject poverty of mind and body, which will perhaps form a juster reason for the pervading moral bondage of the Hindoos, than the more specious ones of climate or religion.

The advantages to be derived from this change are incalculable, not merely as regards the Hindoos themselves but as affecting the prosperity and stability of the British Indian Empire. It is the dawn of a new era. Whenever such an order of men have been created, freedom has followed in its train. Do we need an example? Look at England after the Norman conquest, when the people were serfs, and the landholders lived as the Zeminders of this country did some years ago; but watch their progress upto the Eighth Henry, when wealth became more equally diffused, and continued the view until the son of a butcher dethroned and decapitated a monarch, and made the Republic of England feared and admired by the world.

Do we need an instance of the misfortune of having only two ranks in a country; look at Spain, where every man that can afford it, lives without either mental or bodily labour, and claims the rank of a Hidalgo. Need we go farther? Look at unhapply Poland, where

the peasantry are sold with the soil. With the many examples of this nature before us, it may not be deemed presumptuous to assert, that this middling class of inhabitants, in Bengal, afford the most cheering indications of any that exist at the present period.

Among the beneficial effects already derivable from this new order of thing, it is the greater circulation of money. This admits of proof. In the first place, the cowries are nearly extinct in Calcutta, and in the course of few years they will scarcely be seen in Bengal. Ten years ago, a labourer in Calcutta received two rupees a month, now he is not satisfied with less than four or five, and there is even a scarcity of workmen. A cabinet-maker formerly received eight rupees a month, now he obtains sixteen or twenty rupees for the same period. The price of labour is also increased in the country. Twelve field labourers were formerly to be had for one rupee a day, now six men can only be had for a similar sum. Land for paddy was used to be rented for one rupee a bigah, now a Zemindar asks from his teanants, three or four rupees a bigah. The rice which was wont to be sold for eight annas a maund, may now be averaged at two rupees a maund ; and *the entire district of a Zemindary is now cultivated, when formerly not one-half was tilled ; this is in consequence of the Indigo planting.* (Italics mine—S. T.)

Let us now proceed to investigate the causes of this change. We think it may be demonstrated that the throwing open of the trade, and the admission of Europeans, even with all the restrictions that have been imposed, are the leading causes: because, previous to the Charter of 1813, the state of the country did not bear those decided marks of improvement which it has done since. *A baneful monopoly checked the exertions of individuals, and, by its magnitude, deterred many from embarking in speculations which have since proved profitable pursuit. The arrival of European settlers has encouraged the manufacture of indigo, which, while it benefitted themselves, enriched both England and India, and developed, in some degree, the capabilities of both the soil and climate of the latter.* (Italics mine—S. T.).

Those who have called out so loudly against the increased felicity for our trade with Liverpool, Glasgow etc., have adduced, as an argument in their favour, that the India market has been glutted with English manufactures, and that those who have exported them have suffered severely. *This event happens in all similar changes,*

and is productive of the most beneficial effects. (Italics mine—S. T.). The cheapness of the article induces purchasers, and a taste, before unknown, is thereby created, which, on the goods attaining their standard value, will, if possible, continue to be gratified ; hence new importations are encouraged, and the happiness of the provider and consumer increased. It is, however, evident, that on such an occurrence, a receprocity of trade must take place, and that *if England expects that India will prove a large mart for her produce, she must remove the restrictive, almost prohibitory duties on Asiatic produce, which are disgraceful to a free country.* (Italics mine—S. T.). The East India Company alone, it is said, draw annually from India four million sterling in bullion—upwards of two millions of which are for the payment of dividends to the share-holders, and the remainder for the expenses of the home establishment.

We have conversed with very many native gentlemen who, themselves, are astonished at the increased value of their property, and when asked to assign a cause, they attribute it to the importation of European produce, skill and energy.

If such effects have been already produced, what may not be expected by the equalization of duties of East and West India Sugar —the importation of machinery and the introduction and settlement of Europeans, freed from the odious, over-bearing threat of deportation, so repugnant, so palling to the feelings of every man possessed of a spark of liberty.

Of the advantages derivable from unrestricted commerce, Liverpool is a glorious example, and in our European department of to-day, will be found a list of the shipping which entered and departed from her magnificent docks, which is more than the number for any other port of Great Britain. The revenue produced from which, allowed about one hundred and twenty-two thousand pounds for the improvement and extension of the town.

The late Bishop Heber's writings have been made an argument against the free ingress of Britons here ; but even this amiable prelate has borne the most decided, though, perhaps, unwilling testimony in their favour. If the readers of his "Narrative" will remark, it may be observed that he frequently states in his diary—"the country looks improved, and the people prosperous and happy ;—passed several Indigo factories to-day." The sequel of the passage will afford a clue

to the foregoing part of it."

"বেঙ্গল হেরল্‌ড্‌"-এ প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি লেখকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ইতিহাসের জ্ঞান ও সজাগ দৃষ্টির পরিচয় দেয়। বাংলা দেশে যে একটা পরিবর্তন এসেছে কয়েক বছরের মধ্যে সেটা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বেশ পরিষ্কার ধরা যাচ্ছে। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কলকাতার জমির দাম পনেরো টাকা থেকে তিনশো টাকা হয়েছে। মজুরেরা মাসে দুটাকা মাইনে পেলে ভাগ্য মনে করতো, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে অন্তত চার-পাঁচ টাকা না পেলে তারা খুসি নয়। টেবিল চৌকি তৈরী করে যে ছুতোরেরা আগে মাসে আট টাকা পেতো, এখন তারা খুব কম করে ষোলো টাকা থেকে কুড়ি টাকা দাবী করে। ক্ষেত-মজুরের বেলাতেও পরিবর্তন চোখে পড়বার মতো। আগে এক-টাকায় বারোজন ক্ষেত-মজুর পাওয়া যেতো, ১৮২৯ সালে তার জায়গায় এক-টাকায় ছ জন ক্ষেত-মজুর পাওয়া যায়। আগে এক বিঘে ধেনো জমি এক টাকা খাজনায় পাওয়া যেতো, লেখকের মতে সেই জমি তখন তিন-চার টাকা খাজনায় পাওয়া যাচ্ছে। চালের দাম আট আনা মণ থেকে দু টাকা মণ হয়েছে। আগে জেলার অর্ধেক জমি অনাবাদী পড়ে থাকতো, নীল-চাষের ফলে জেলার প্রায় অধিকাংশ জমি চাষে এসেছে। এই সব তথ্য পরিবেশন করবার পর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দিকে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর ভাষায়, "একটি শ্রেণী উদ্ভূত হয়েছে, আগে যার কোনো পাত্তা ছিলো না। অভিজাত সম্প্রদায় আর গরীব, এই দুয়ের মধ্যে এদের স্থান, আর এরা উত্তরোত্তর একটি শক্তিশালী শ্রেণী হয়ে উঠছে। এদের উদ্ভবের আগে দেশের ঐশ্বর্য অল্প কিছু লোকের হাতে ছিলো, এই কতিপয় লোকদের উপরে আর সকলে নির্ভর করতো। বেশীর ভাগ লোক কায়িক ও মানসিক দারিদ্র্যে ডুবে ছিলো।"

এই ভাবে লেখক বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও এই শ্রেণীর উত্তরোত্তর ক্ষমতা-লাভের ইতিহাস আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। তাঁর মতে দেশের এই চমকপ্রদ অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও তার ফলস্বরূপ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, এই দুই-ই সম্ভব হয়েছে ইয়োরোপীয়দের এদেশে এসে ব্যবসা করার অধিকার দেওয়ার ফলে। যতদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর এক-চেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে ইয়োরোপীয়দের এদেশে এসে ব্যবসা করবার অধিকার দেওয়া হোতো না ততদিন এই উন্নতির লেশমাত্র চিহ্ন ছিলো না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের চার্টারের ফলে যখন ইয়োরোপীয়দের কিছুটা সুবিধে দেওয়া হোলো এ দেশে এসে বাণিজ্য করবার ও জমি কিনে চাষবাস করবার তখন থেকেই এই উন্নতির সূত্রপাত হোলো। ইয়োরোপীয়েরা গ্রামাঞ্চলে বসবাস সুরু করায় নীলের চাষ আরম্ভ হোলো আর তার ফলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ দুই-ই লাভবান হোলো। লেখক ইংরেজ, তবু বলতেই হবে যে তিনি কপট নন, শুধু ভারতবর্ষ আর্থিক লাভ করলো আর ইংলণ্ড পরমার্থিক লাভ করলো, এরকম মিথ্যে কপটতার ধার দিয়েও তিনি যাননি। তারপরে তিনি বলছেন যে অনেকে খুব হৈচৈ সুরু করেছেন যে লিভারপুল আর গ্লাসগো থেকে প্রভূত মাল এখানকার বাজারে আসায় বাজার মালে ভর্তি হয়ে গেছে, তার ফলে জিনিসের দাম কম হয়ে গেছে আর যারা মাল আমদানী করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লেখক এর উপর মন্তব্য করে বলছেন যে—"যেখানেই এই পরিবর্তন সাধিত হয় (অর্থাৎ কিনা বাজারের উপর একচেটিয়া ব্যবসাদারদের দখল ভেঙ্গে সব ব্যবসাদারদের মাল আনবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়—সৌম্যেন্দ্রনাথ) সেখানেই এই রকম ঘটে অর্থাৎ মাল-আমদানী-করনেওয়ালারা গোড়ায় গোড়ায় লোকসান খায়। কিন্তু এই পরিবর্তন খুব ভালো হিতকরী ফল দেয়। জিনিসের দাম সস্তা হোলে বেশী খরিদ্দার

এসে জোটে। পূর্বে জিনিস সম্বন্ধে যে রুচি ছিলো না, সে রুচি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। জিনিসগুলির একটা বাঁধা দাম আস্তে আস্তে নির্ধারিত হয়ে যায়, তাই নতুন রুচিও পরিতৃপ্ত হয় এবং তার ফলে আরো নতুন নতুন জিনিসের আমদানী হতে থাকে।"

লেখক এমনি সোজা করে অবাধ-বাণিজ্য-নীতির (Free Trade-এর) সুফল বর্ণনা করেছেন। ক্যাপিটালিজমের সম্প্রসারণ ও অগ্রগতির জন্যে অবাধ-বাণিজ্য-নীতি ছিলো সেদিন একমাত্র নীতি। একচেটিয়া বাণিজ্যের শিকলে আটকে পড়ে ক্যাপিটালিজম্‌ এগোতে পারছিলো না। নতুন নতুন জিনিস তৈরী হওয়া সম্ভব ছিলো না সেই অবস্থায়। জিনিস-গুলির দাম কমবারও কোনো সম্ভাবনা ছিলো না ক্যাপিটালিজমের আওতায়। সাগরের এপার ওপার দু পারেই তখন একচেটিয়া বাণিজ্য-নীতির সঙ্গে অবাধ-বাণিজ্য-নীতির জোর লড়াই চলতে লাগলো।

[ক্রমশঃ]

একটি বিচিত্র রজনী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

মাসখানেক ধরে বাণ্ডিলটা আমার কাছে পড়ে ছিল। রেলকর্মী রিক্রিয়েশন ক্লাবের সম্পাদক মাঝে মাঝে ফোন করেন, মাঝে মাঝে পোস্টকার্ডে পত্রাঘাত : 'লেখাগুলি কি দেখছেন? ফাংশনের দিন ঠিক হয়ে গেছে। এবার কম্পিটিশনের রেজাল্টটা জানতে না পারলে আমাদের বড় অসুবিধেয় পড়তে হবে।'

অসুবিধা আমারও কম নয়। ছোট বড় খান পঁচিশেক খাতা ভদ্রলোক আমাকে গছিয়ে দিয়ে গেছেন। পঁচিশজনের এই সাহিত্যপ্রক্লাসের ভিতর থেকে তিনটি রচনা আমাকে বেছে বের করতে হবে। স্থির করতে হবে কে প্রথম কে দ্বিতীয়, কারই বা তৃতীয় স্থান।

শুরুতেই আমি সেক্রেটারীকে হাত জোড় করে বলেছিলাম, 'আমাকে রেহাই দিন। বাছাই করবার ক্ষমতা যদি থাকবে তাহলে কাগজের সম্পাদক হতাম; দুরু দুরু বুক নিয়ে পাঠক আর সমালোচকদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম না।'

কিন্তু সেক্রেটারী রেহাই দেননি। বলেছেন, 'দিন না একটু কণ্ট করে দেখে। সবাই খুশি হবে।' তারপর গলা নামিয়ে বলেছেন, 'সবলেখা আপনার আগাগোড়া না পড়লেও চলবে। প্রথম দুটি একটি পাতা, এমন কি দু একটা প্যারাগ্রাফ পড়লেই তো বুঝতে পারবেন—।'

'রাঁধুনীরা যেমন দু একটা ভাত টিপে এক হাঁড়ি ভাতের কথা বলে দেয়। কিন্তু আমি তো তেমন রাঁধুনী নই।' অনুনয় বিনয়ে কোন কাজই হয়নি। মোটা সুতো দিয়ে বাঁধা এক রাশ খাতা ভদ্রলোক আমার টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বিদায় নিয়েছেন।

তারপর ফোন আর চিঠি। শেষ পর্যন্ত বাইশ তেইশ বছরের এক যুবক এসে বলল, 'কাল আমাদের ফাংশন। লেখাগুলি নিতে এসেছি।'

আমি একটু মাথা চুলকে বললাম, 'তাই তো কাজকর্মের এত চাপ—। আমি যে কিছুই করে উঠতে পারিনি।' ভেবেছিলাম রাগ করে ছেলেটি খাতাগুলি নিয়ে যাবে। কিন্তু তা করল না। বলল, 'বেশ তাহলে আজ দেখে রাখুন। কাল সকালে এসে নিয়ে যাব।'

আমি অসহায়ের মত বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি কি করে হবে।' ছেলেটি কিন্তু চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা সকালে না হোক ফাংশনের ঘণ্টা দুই আগে পেলেই আমাদের চলবে। না হয় আর একটু সময় আপনি নেবেন। আপনি না যাওয়া পর্যন্ত তো সভা আরম্ভ হবে না।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি আমি আবার কোথায় যাব।'

ছেলেটি চোখ বড় করে বলল, 'কেন আমাদের ক্লাবে। না না, তা হয় না এখন আর আপনি না করতে পারেন না। আমরা অ্যানাউন্স করে দিয়েছি। না গেলে আমাদের মান মর্যাদা কিছু থাকবে না। আপনি তো অনেকদিন আগেই আমাদের সেক্রেটারীকে কথা দিয়েছিলেন।'

মনে মনে ভাবলাম কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও কম করিনি। ভেবেছিলাম রচনাগুলি তাড়াতাড়ি দেখে দিলে সভায় উপস্থিত থাকবার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাব। কিন্তু সব ব্যাপারেই বড় দেরি হয়ে গেছে। তাছাড়া যেখানে ক্লাবের মান মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন—। ছেলেটির উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর অন্য কোন কথা বলতে সাহস

পেলাম না।

তাকে বিদায় দিয়ে ভালো ছেলের মত পেনসিল হাতে প্রতিযোগিতার খাতাগুলি নিয়ে বসলাম।

রচনার বিষয় 'একটি বিনিদ্র রজনী'।

প্রত্যেকেই নিজের জীবনের একটি করে রাত জাগার কাহিনী লিখেছেন। সবই উত্তম পুরুষে। বেশির ভাগই দেখলাম আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর প্রসঙ্গ। কারো বাপ মা। কারো বা বন্ধু। মৃত্যুশয্যায় উদ্বেগ ভয় আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় রাত্রিযাপনের কাহিনী। একজন লিখেছেন বাল্যস্মৃতির কথা। সবান্ধবে গ্রামান্তরে গিয়ে যাত্রার আসরে নেমে রাত ভোর করে বাড়িতে ফিরে এসে অভিভাবকের হাতে কানমলা খাওয়ার বিবরণ। কাল সেই লাঞ্ছনার উপর সন্দেহে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। যাত্রার আসরে দুজন যোদ্ধার দুখানি শাণিত তরবারিই লেখকের মনে বেশি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে বলে বোধ হল। আর একজন লিখেছেন জীবিকার দায়ে রাত্রি জাগরণের বিবরণ। এক সহকর্মীর সঙ্গে ইঞ্জিনে কয়লা জোগাতো জোগাতে এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশন পৌঁছবার কাহিনী। শেষে লেখক মন্তব্য করেছেন শুধু একটি নয় এমন শত শত বিনিদ্র রাতই তাঁর কাটাতে হয়েছে, কাটাতে হবে, কিন্তু সবগুলি রাত্রির বিবরণ তো আর লেখা যায় না।

ভাবলাম তাতো ঠিকই। অত কাগজ কোথায়, অত সময় কোথায়। তাছাড়া যারা রোজ সারারাত জাগে তারা কি দিনে লিখবে না ঘুমোবে।

বিষয় বস্তুর দিক থেকে লেখাটি নতুন ধরনের। কিন্তু ভাষা কাঁচা, পদে পদে বর্ণাশুদ্ধি এবং ব্যাকরণবিচ্যুতি। আমি দ্বিধায় দুলতে লাগলাম একে প্রধান গৌরবের আসন দেব কি দেব না।

তারপর আরো কয়েকটি রচনা চোখে পড়ল। একজন লিখেছেন তাঁর ফুলশয্যার রাতের কথা। প্রথম রাত্রিতে কিশোরী নববধূর লজ্জা ভাঙাতে পারেননি। একেবারে শেষ রাত্রে ছিল লগ্ন। আলাপের সুযোগই হয়নি। তা ছাড়া চারদিকে আড়ি পেতে ছিলেন কনের দিদি বউদি ঠানদিদের দল। বাসি বিয়েতে দিন আছে কিন্তু রাত নেই। রাত্রে দেখাসাক্ষাত নিষেধ। তৃতীয় দিন ভোর হতে না হতেই লেখকের আসন্ন রাত্রির কথা মনে পড়েছে। কিন্তু ভোরের পরেই তো আর রাত আসে না। একটি বিরহ রজনী কাটাবার পরেও রোদ আস্তে আস্তে ওঠে। বেলা ধীরে ধীরে বাড়ে যেন কোন গরজ নেই। ফুল শয্যার যে ফুল তারও একটি দীর্ঘ বোঁটা আছে। আষাঢ়ের বেলা যাই যাই করেও যায় না। আকাশের মেঘ মাঝে মাঝে আসন্ন সন্ধ্যার আভাস দেয় কিন্তু খনিক পরেই সরে গেলে দেখা যায় রোদ চিকচিক করছে। পরিহাস রসিকা বউদির দু চোখের কৌতুকের মত। তারপর আষাঢ়ের সেই দীর্ঘদিনও শেষ পর্যন্ত কাটল। সন্ধ্যা হল। শুরু হল বউভাতের ঝামেলা। মিষ্টান্নলোভী আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ছাদের ওপর পাত পাতলেন। গুণতিতে অসংখ্য। লেখকের বাবা আর দাদারা তাঁদের আদর আপ্যায়নে পঞ্চমুখ। কিন্তু লেখকের মুখ ভার। আজও রাত বারোটা পার হল। যৌতুকে পাওয়া নতুন ঘড়িটির দিকে তিনি বারবার তাকান আর ভাবেন ফুলশয্যাতেও এত কাঁটা।

রাত প্রায় একটার সময় শোবার ঘরে ডাক এল। তখনো ঘরে বোন আর বউদিদের ভিড়। আচারে স্ত্রীলোকের শ্রান্তি নেই। শেষ পর্যন্ত ভিড় ভাঙল, দয়া হল ওঁদের। ঘরে এখন শুধু লেখক আর তাঁর জীবন সঙ্গিনী। কিন্তু শয্যার দিকে এগোতে তাঁর অসীম লজ্জা।

লেখকই আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন, বিদ্যুতবাতি নিবিয়ে দিলেন। সাধাসাধি করে নববধূকে তার নিজের জায়গায় নিয়েও এলেন। কিন্তু তার বেশি এগোতে সাহস পেলেন না। এত শিক্ষা, এত প্রতীক্ষা সবই বৃথা হতে চলল। বিবাহিত অভিজ্ঞ বন্ধুবান্ধবের এত পরামর্শ কিছুই কাজে এল না। একটু এগোতে গিয়ে মনে হয় মেয়েটির সঙ্গে আলাপ নেই পরিচয় নেই যদি সে তাঁকে অভদ্র ভাবে কি অতিমাত্রায় অভিজ্ঞ বলে মনে করে। ছি ছি ছি তাহলে বড় লজ্জার কথা হবে। কিন্তু পিছিয়ে থেকেও স্বস্তি নেই। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা মেয়েটি তাঁকে নিতান্ত আনাড়ি মনে করছে। প্রথম রাত্রেই স্ত্রীর কাছে যদি এমন বোকা বনে যান তাহলে জীবনের বাকি রাতগুলির দশা কি হবে। রাত বাড়তে লাগল, শেষ হতে চলল লেখক আকুল হয়ে উঠলেন। কোন বিদ্যাই কাজে লাগছে না। পরীক্ষা দিতে এসে ছাত্র যেন দেখতে পেয়েছে প্রশ্নগুলি চেনা জায়গা থেকেই এসেছে। কিন্তু বড় ঘুরোন জড়ানো ভাষা। নোট মুখস্থ উত্তরগুলি বসাতে ছাত্র ভরসা পায় না যদি ঠিক ঠিক না লাগে। আবার দুকলম যে বানিয়ে লিখবে সে সাহসও নেই, যদি গ্রামার ঠিক না হয়।

সেই মূঢ় ছাত্রের মত লেখক সারারাত জেগে একখানি ব্লাঙ্ক পেপার সাবমিট করলেন। খাতার কোথাও একটি কলমের আঁচড় দিতে পারলেন না।

শেষ রাত্রে চাঁদ উঠল। চাঁদের আলো বিছানার ফুলের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। পড়ল আরো একজনের মুখে যে সোনার অলঙ্কারে সেজেছে, ফুলের অলঙ্কারেও সেজেছে। ফুল শয্যায় বউ এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। লেখক চেষ্টা করলেন তার ঘুম ভাঙাতে। কিন্তু কিছুতেই পারলেন না। যে জেগে ঘুমোয় তার ঘুম কি ভাঙানো যায়। তাই একজনের ছদ্ম নিদ্রা দেখতে দেখতে আর একজনের বিনিদ্র রজনী ভোর হয়ে গেল।

কাহিনী শেষ করে আমি একটু হাসলাম। বিষয় মামুলী, ভাষা আর ভঙ্গি দুইই হালকা। তবু লেখার মধ্যে মুন্সীয়ানা আছে। এই প্রতিযোগীকেই বোধ হয় প্রথম আসনে বসাতে হবে।

আরো কয়েকটি কাঁচা রচনা সরিয়ে রাখবার পর আর একটি দাম্পত্য গল্প চোখে পড়ল। ফুল শয্যার রাত নয়। তারপর অনেক দিন অনেক রাত্রি চলে গেছে। লেখক লিখেছেন তাঁর মধ্য বয়সের গল্প। মধ্য বয়সের এক দাম্পত্য রজনী। তার আগের কয়েক রাত ধরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া। কারণ দারিদ্র্য, অনটন। মাসের শেষ সপ্তাহে বাজার করবার টাকা নেই, বাড়িওয়ালা বাকি ভাড়ার জন্যে দুদিন বাদে বাদেই এসে অপমান করে যাচ্ছে, মেজো মেয়েটার টাইফয়েড, এমন সময় স্ত্রী যদি বলে ঘরে চাল বাড়ন্ত তাহলে পুরুষের কি খুন করতে ইচ্ছা হয় না? লেখকেরও সেই সাধ হয়েছিল। চেয়েচিন্তে চালের জোগাড়টা তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত করলেন, কিন্তু ঝগড়া মিটল না। শুধু চাল পেয়েই স্ত্রী সন্তুষ্ট নন। তাঁর আরো চাই। তেল, নুন, ডাল, তরকারি চাই। রোগা মেয়ের জন্যে ওষুধ পথ্য দরকার। কোনটা বাদ দিলেই চলে না। লেখক বলেন, 'তোমার অত খাঁই আমি মেটাতে পারব না।' স্ত্রী তাঁর চোয়ালজাগা মুখখানা বিকৃত করে বললেন, 'আমার খাঁই, না তোমার ছেলেমেয়েদের? কেন বিয়ে করবার সময় মনে ছিল না! ছটি সন্তানের বাপ হওয়ার সময় মনে ছিল না যে তাদের খাওয়াতে হবে পরাতে হবে অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসা করাতে হবে?'

স্বামী বললেন, 'সবই মনে ছিল। কিন্তু তোমার মুখ নাড়া খেতে খেতে নিজের বাপের নাম পর্যন্ত ভুলেছি। যা দজ্জাল মেয়ে মানুষ তুমি।'

স্ত্রী বললেন, 'তুমি আবার পুরুষ নাকি। পুরুষ হলে নিজের স্ত্রীকে অমন দুর্নাম দিতে না।'

দিন নেই রাত নেই রোজ ঝগড়ার ঝড় বয়ে যায়। স্বামী বলেন, 'তোমার মত অলক্ষ্মীকে ঘরে এনেই আমার এই দশা।'

স্ত্রী বলেন, 'তোমার মত অক্ষম পুরুষের হাতে পড়ে আমার জীবনে কোন সুখও হল না শান্তিও হল না।'

ছেলে মেয়েদের মধ্যে যারা বড় তারা ঝগড়ার সময় বাইরে চলে যায় যারা ছোট তারা অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। অপেক্ষা করে কখন এই ঝড়ের ঝাপটা থামবে।

একদিন অফিস বেরোবার সময় স্বামী ঝগড়ার মুখে চরম অভিসম্পাত দিয়ে গেলেন 'মর মর মর। বিষ খেয়ে হোক, গলায় দড়ি দিয়ে হোক, জলে ডুবে হোক যে ভাবে পার আমায় নিষ্কৃতি দিয়ে যাও।'

'মরব?'

'হ্যাঁ।'

'মরব?'

'হ্যাঁ।'

'মরব?'

স্বামী এবারও বিনা দ্বিধায় বললেন, 'হ্যাঁ।'

স্ত্রী বললেন, 'তিন সত্যি করলে। ফিরে এসে আমার মুখ আর তুমি দেখতে পাবে না।'

অফিসে এসে টিফিনের আগে পর্যন্ত ভালোই কাটল। রাগটা তখনো মেটেনি। স্বামী মনে মনে ভাবলেন যদি মরে বেশ হয় আমার হাড় জুড়োয়। কিন্তু টিফিনের সময় কৌটোটি খুলে মন বড় খারাপ হয়ে গেল। অন্যদিনের মতই সেই কখানা আলুর কুচি আর দুখানা রুটি দেখে শাঁখা পরা এক জোড়া শাঁখাহাতের কথা তাঁর মনে পড়ল।

ইচ্ছা হল তখনই চলে আসেন কিন্তু পারলেন না। কাজের চাপ অনেক বেশি। টেবিলে গাদা গাদা এরিয়ার ফাইল পড়ে রয়েছে। শেষ করতে করতে সন্ধ্যা। সহকর্মীর কাছ থেকে দুটি টাকা ধার করে তিনি বেরিয়ে এলেন। বৈঠকখানার বাজার থেকে মাছ কিনলেন, মনোহারী দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কি মনে হল এক শিশি আলতাও নিলেন সস্তা দেখে। স্ত্রী একদিন বলেছিলেন, 'জলে জলে পা দুটো খেয়ে গেছে। পচে গন্ধ হয়েছে। এক শিশি আলতা এনো তো।'

বাজার নিয়ে স্বামী হাসিমুখে ঘরে এলেন। কিন্তু ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালাবার কেউ নেই না কি?

ছোট মেয়েটাকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুঁটি তোর মা কোথায় রে?'

আট বছরের মেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'বাবা, মা নেই।'

পুঁটির বাবার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, 'নেই কিরে—হতভাগা মেয়ে। কোথায় গেছে তাই বল।'

পুঁটি কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল, 'মা বলল আমি মরতে চললুম।'

আমি বললাম, 'আমরা কার কাছে থাকব'। মা বলল, 'তোদের বাপের কাছে থাকিস।

আমি মরে গেলে সেই তোদের বাপও হবে, মাও হবে। তোদের আলাদা মার আর দরকার নেই।'

ছেলেরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু কেউ এখনো ফেরেনি। ভদ্রলোক মাছ আর আলতার শিশি নামিয়ে রেখে স্ত্রীকে খুঁজতে বেরোলেন। ঝগড়ার কথা তো বাইরের লোককে বলা যায় না। তবু পাড়াপড়শীর বাড়িতে বাড়িতে গেলেন। কৌশলে পলাতকা স্ত্রীর সন্ধান নিলেন। কিন্তু কারো বাড়িতে তিনি যান নি। গঙ্গার ধারে গেলেন। সেখানেও কোন চিহ্ন নেই। জন দুই লোক বসে বসে বিড়ি খাচ্ছে আর খোসগল্প করছে। তাদের জিজ্ঞেস করলেন কোন স্ত্রীলোককে তারা জলের ধারে যেতে দেখেছেন কিনা। একজন কোন জবাব দিল না আর একজন হেসে বলল, 'আরে দাদা ওই মতলব নিয়ে যদি কেউ এসেই থাকে তাহলে কি সে আর লোক দেখিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছে? যেতে হলে চুপি সারেই চলে গেছে।'

ভদ্রলোক শূন্যবুকে ভরা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন, 'মা গঙ্গা যদি তাকে নিয়েই থাকেন, কোন চিহ্ন রেখে দেবেন কেন?'

পা যেন পাথরের মত ভারি, নড়তে আর চায় না। মন যেন পাহাড়ের মত স্থবির চলতে আর পারে না। হয় তো মিনিট পাঁচেকের বেশি তিনি সেখানে দাঁড়ান নি। কিন্তু মনে হল যেন যুগের পর যুগ চলে গেছে। একজন আর একজনকে ছেড়ে ওপারে চলে গেছেন। যিনি পড়ে রইলেন তাঁর আর স্বেচ্ছায় পার হবার সাধ্য নেই। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক একটি করে ঢেউ গোনা ছাড়া আর কিছু করবার নেই তাঁর।

এই অবস্থায় থানায় একবার যাওয়া দরকার আর হাসপাতালে। যদি জলে ঝাঁপ দেওয়ার পর কেউ তাকে তুলে থাকে, কি গাড়ি চাপা পড়বার পর কেউ যদি কুড়িয়ে নেয়। কিন্তু তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল কি হবে আর চেষ্টা করে যে গেছে তাকে আর পাওয়া যাবে না। থানা কি হাসপাতালে একা যেতে ভরসা হল না। ভাবলেন বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবেন কি কোন প্রতিবেশী বন্ধুকে।

এগলি ওগলি ঘুরে পাথরে গড়া পা দুখানি টেনে টেনে তিনি কোন রকমে বাড়ির সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। এখনো কোনো সাড়াশব্দ নেই। সময় বুঝে রাস্তার সব আলো নিভে গেছে। পাড়াসুদ্ধ অন্ধকার।

ভদ্রলোক হাতড়ে হাতড়ে কোন রকমে কড়াটা নাড়লেন। বুঝতে পারলেন না শব্দ হল কিনা। নিজের বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দই বেশি করে কানে আসতে লাগল।

যে কোন শব্দেই হোক দরজাটা খুলে গেল। তিনি দেখলেন এক টুকরো জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে ছায়ার মত একটি নারী। আঁধারের মধ্যে এক ক্ষীণ দীপশিখা।

তিনি অপলকে সেই শিখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কতক্ষণ যে গেল তার আর ঠিক নেই।

অমন করে তাকালে কোন মেয়ে কি চোখ না নামিয়ে নিয়ে পারে? তা তার রূপ থাকুক আর না থাকুক, যৌবন যত আগেই বিদায় নিয়ে চলে যাক।

একটু বাদে ফের চোখ তুলে স্ত্রী বললেন, 'সারারাত দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি? ভিতরে এসো।'

ভদ্রলোক এবার হেসে বললেন, 'বড় বউ, তবে যে বলেছিলে মরবে!'

তাঁর স্ত্রী বললেন, 'চেষ্টা কি আর করি নি ভেবেছ? পারলাম না কাচ্চা বাচ্চার বেড়ি

দিয়ে আমাকে যমের হাত থেকেও কেড়ে রেখেছ। তুমি আমার এত বড় শত্রু।'

সেই রাত্রে তাঁরা ভোর না হওয়া পর্যন্ত জেগে ছিলেন। স্বামীও শ্রান্ত, স্ত্রীও শ্রান্ত। কিন্তু আশ্চর্য, তবু কারো চোখে ঘুম আসে নি।

একটু ভেবে এই গল্পটিকেই আমি সবচেয়ে বেশি নম্বর দিলাম। যদিও বর্ণনায় অতিরঞ্জন আছে, ঘটনার বিন্যাসে কিছু কিছু শৈথিল্য, তবু যতগুলি রচনা পেয়েছি তাদের মধ্যে এই লেখাটিই সবচেয়ে ভালো।

কিন্তু শুধু বিচারপর্বেই কর্তব্য শেষ হল না। পরদিন বিকালে সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে আমাকে তাঁদের অফিসেও যেতে হল। সভাপতিকে নিজের মুখে ফল ঘোষণা করতে হবে, স্বহস্তে পুরস্কার প্রদান।

হলঘরের অর্ধেক জুড়ে প্রতিযোগীরা বসেছেন। সবাই রেলওয়ের নানা বিভাগে কাজ করেন। বেশির ভাগই কেরানী। কিন্তু আজ তাঁদের অন্য ভূমিকা। আজ তাঁরা কেউ জীবিকার জন্যে কলম ধরেন নি। নিজের জীবনকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। সামনের সারিতে কয়েকটি মহিলা এবং পদস্থ অফিসারকেও দেখা গেল। তাঁরা বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত।

ক্লাবের সম্পাদক মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করলেন। এর আগে তাঁরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী করেছেন আর একবার তরুণ কবিদের সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্লাবেরই একজন সদস্যের লেখা একখানি নাটক অভিনয় করবার ইচ্ছাও তাঁদের আছে।

এবার আমাকেও কিছু বলতে হল। বললাম, প্রতিযোগিতায় যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁরা আসলে সহযোগী। এই অনুষ্ঠান তাঁদের সকলের চেষ্টায় সার্থক হবে। তাঁদের প্রত্যেকের রচনাই অনন্য। এক লেখকের সঙ্গে আর এক লেখকের তুলনা সঙ্গত নয়। এমনকি একই লেখকের এক গল্পের সঙ্গে আর এক গল্পের তুলনা চলে না। কারণ একেকটি লেখা তাঁর স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর। যত লেখা তত লেখক।

আমি মুখবন্ধ শেষ করবার পর ক্ষীণকায় সেক্রেটারী ফাইল হাতে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'সভাপতির বিচারে প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ বন্ধু বামাপদ দাশ। তাঁকে ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা একটি রৌপ্যপদক উপহার দিচ্ছি।'

বেঁটে মত এক ভদ্রলোক হাসিমুখে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এলেন। বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। মাথার চুল বেশির ভাগই পাকা। সামনের সারির গুটি তিনেক দাঁত নেই। তিনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার সহকর্মীরা আমাকে যে গৌরবে আজ ভূষিত করলেন তা আমি জীবনে আর কোনদিনই পাই নি। কোনদিন স্কুলে কলেজের পরীক্ষায় আমি পুরস্কার পাই নি, কোন কাজের জন্যে প্রশংসা শুনি নি, এমন গৌরব আমার এই প্রথম। এই বুড়ো বয়সে প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি লেখকও নই। জীবনের একটি সত্য ঘটনাকে কোন রকমে আপনাদের সামনে ধরে দিয়েছি মাত্র। তরুণ সেক্রেটারী আমাকে না জানিয়ে লেখাটিকে প্রতিযোগিতার ফাইলে বেঁধে ফেলেছেন।'

এরপর তিনি তাঁর লেখাটি পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু দুপাতা এগোতে না এগোতেই আবেগে তাঁর গলা রুদ্ধ হয়ে এল, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

তিনি বারবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই লেখাটি শেষ করতে পারলেন না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেই বললেন, 'আর কেউ দয়া করে লেখাটি পড়ে দিন।'

সেক্রেটারীর ইঙ্গিতে একজন সুদর্শন যুবক রচনার বাকি অংশ পড়ে শোনালেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ভালো, উচ্চারণ বিশুদ্ধ।

কিন্তু পাঠক গল্পের শেষে এসে পৌঁছতে না পৌঁছতে লেখক ফের কান্নার সুরে বলে উঠলেন, 'আমি তাঁকে বাঁচাতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।'

আমি একটুকাল অবাক হয়ে থেকে বললাম, 'কি ব্যাপার। তবে কি আপনার স্ত্রী সেই রাত্রেই—'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'না স্যার, তা নয়। আমি এক বর্ণও মিথ্যে লিখি নি। সেদিন সে সত্যিই ফিরে এসেছিল। কিন্তু গত বছর দুদিনের জ্বর সে আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কী যে হল ডাক্তার মোটে ধরতেই পারল না।'

ভদ্রলোক ফের বসে পড়ে মুখ নিচু করে রইলেন। চোখে কিছু না দেখা গেলেও সবাই বুঝতে পারল তিনি কাঁদছেন।

নীরব অস্বস্তির মধ্যে সভার কয়েকটি মুহূর্ত কাটল।

একটু বাদে সহকারী সম্পাদক তাঁকে সাহিত্য সভা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ফেলে যাওয়া মেডালের বাক্সটিও তিনি তুলে নিলেন।

সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার মনে হল ভদ্রলোকের আর একটি বিনিদ্র রজনীর ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তিনি কি আর দ্বিতীয় গল্প লিখতে পারবেন?

হঠাৎ আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে ক্লাবের সেক্রেটারী মাইকের সামনে মুখ নিয়ে ঘোষণা করলেন, 'এবার গল্প পড়বেন শ্রীবীরেন্দ্রকুমার তালুকদার। তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। আমরা তাঁকে একটি কলম উপহার দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন তাঁর ফুলশয্যার রাতের গোপন কথা।'

সামনের সারিতে যে কয়েকটি সাশ্রুনয়না মহিলা বসেছিলেন তাঁদের মুখে এবার হাসি ফুটল।

নৈরাজ্যবাদ : প্রজ্ঞানযুগ

অতীন্দ্রনাথ বসু

৬। ফ্রান্স : পিয়ের জোসেফ প্রুদঁ (১৮০৯—৬৫)

ফরাসী বিপ্লবের পর ইয়োরোপের আসরে নেপোলিয়নের দক্ষযজ্ঞ চলল। দেড়শ বছরের রাষ্ট্রবিন্যাস লণ্ডভণ্ড করে, বংশগত রাজমুকুট ও রাজদণ্ড ভেঙেচুরে ধূলিসাৎ করে তিনি চারদিকে আতঙ্ক সৃষ্টি করলেন। ইয়োরোপের জাতীয়তা স্বাধীনতার সংগ্রামে রুখে দাঁড়াল। এই জনশক্তির আঘাতে নেপোলিয়নের পতন হল। রাজরাজন্যরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পুনরভিষেক করলেন। পনের বছর ধরে তাঁদের শাসনের চাপে ইয়োরোপীয় জাতিগুলির প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। ১৮৩০ সালে পারীর রাজপথে আবার বেরিয়ে এল বিক্ষুব্ধ জনতা, বুরবোঁ রাজতন্ত্র ভেঙে পড়ল, দেখাদেখি অন্যান্য দেশেও জন-বিদ্রোহ সংক্রামিত হল। বেলজিয়াম হল্যাণ্ডের অধীনতা থেকে মুক্ত হল। কিন্তু ইয়োরোপের ওপর প্রতিবিপ্লবী শাসনের বজ্রমুঠি শিথিল হল না। অবশেষে ১৮৪৮ সালে এল হিসাব নিকাশের পালা। পারীর বিস্ফোরণের আগুন ইয়োরোপের নগরে নগরে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। বিধাতার রুদ্রদণ্ড নেমে এল পুরাতন বিধানের ওপর। ইতিহাসের মোড় ঘুরল। আরম্ভ হল জাতীয়তা ও স্বাধীনতার যুগ।

১৮৪৮ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই যুগটির পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনা নেই। এ যুগ সংঘাত ও বিপ্লবের যুগ—এযুগে প্রাচীন ও নবীন, দীর্ঘদিনের স্থিতস্বার্থ ও জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা যুদ্ধের নেশায় মেতেছে—সারা পৃথিবী তোলপাড় করে ঝড় তুলেছে, কাঁপন লাগিয়েছে আমেরিকা থেকে চীন পর্যন্ত। বিপ্লবের লীলাভূমি ফ্রান্সে এই ঝড়ের সূত্রপাত, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পারীর গণ-অভ্যুত্থানের ফলে অর্লিয়ানিস্ট রাজতন্ত্রের পতন ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পত্তন হল। প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলনের ডামাডোলের মধ্যে জন্ম নিল শিল্পবিপ্লবের দান নূতন এক সমাজদর্শন,—স্যাঁ সিমঁ, ফুরিয়ে ও লুই ব্লাঁক সমাজবাদী বিধানের নক্সা রচনা করলেন। স্বাধীনতা ও জাতীয়তার মন্ত্র দিলেন ম্যাট্‌সিনি, তার সংগ্রাম চালনা করলেন গ্যারিবল্‌ডি, কসাথ। নৈরাজ্যবাদের বাণী উচ্চারণ করলেন প্রুদঁ, ম্যাক্‌স্‌ স্টার্নার ও বাকুনিন। নিয়তির এমনই পরিহাস, যে দর্শনে এঁদের এবং কার্ল মার্ক্‌সের হাতে খড়ি জার্মান দিক্‌পাল হেগেলের কাছে—যিনি নিরঙ্কুশ সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্তব করে গেছেন। বোধ হয় তাঁর দ্বান্দ্বিক নিয়মকে প্রমাণ করবার জন্যেই হেগেলবাদ তার প্রতিবাদের জন্মদান করল। কিন্তু হেগেলের এই প্রতিবাদী শিষ্যদের মধ্যেই বা কতটুকু সামঞ্জস্য ও মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

ম্যাক্‌স্‌ স্টার্নার ব্যতীত অন্যান্য নৈরাজ্যবাদী ও সমাজবাদীরা সর্বপ্রথম ব্যক্তিসম্পত্তিকে আক্রমণ করল। নৈরাজ্যবাদীরা আরও অগ্রসর হয়ে তাদের বাক্যবান প্রয়োগ করল ধর্ম, নীতি ও রাষ্ট্রের ওপর। কিন্তু তাদের আসল ও মৌলিক লক্ষ্য হল সম্পত্তি। কারণ সম্পত্তিই যাবতীয় বৈষম্যের মূল, ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার দুরতায় বিঘ্ন। শিল্পবিপ্লবের পর এই বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে। শিল্পপতিরা বেপরোয়াভাবে শ্রমিকদের শোষণ করে চলেছে। রাষ্ট্র তাদের তাঁবেদার। তাদের শোষণতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্রশক্তির ওপর ভর করে। সরকার যে বিত্তবান

শ্রেণীর একটি হাতিয়ার এ কিছু নতুন কথা নয়। সমাজবাদী ও নৈরাজ্যবাদীদের অনেক আগে এরিস্টট্‌ল্‌ থেকে এডাম স্মিথ পর্যন্ত বিত্তবান শ্রেণীর দার্শনিকরা এই তিক্ত সত্য স্বীকার করে গেছেন।

> সরকারী শাসন যে পরিমাণে সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের জন্য গঠিত হইয়াছে, সে পরিমাণে আসলে ইহার কাজ দরিদ্রের বিরুদ্ধে ধনীকে রক্ষা করা, অথবা যাহাদের কোনো সম্পত্তি নাই তাহাদের হাত হইতে যাহাদের সম্পত্তি আছে তাহাদিগকে রক্ষা করা।

এ উক্তি মার্ক্‌স্‌ অথবা বাকুনিনের নয়, নূতন ধনবিজ্ঞানের স্রষ্টা বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রী এডাম স্মিথের[১], ১৭৭৬ সালের লেখা। সত্তর বৎসর পরে প্রুদঁ, মার্ক্‌স্‌ ও বাকুনিন শত শত পৃষ্ঠা জুড়ে এই মন্তব্যেরই বিস্তার করেছেন।

১৮০৯ সালের পনেরোই জানুয়ারী ফ্রান্সের পশ্চিম প্রান্তে বেসাঁস শহরের উপকণ্ঠে গ্রাম্য পরিবেশে পিয়ের জোসেফ প্রুদঁর জন্ম হয়। পিতার ছিল সামান্য মদ চোলাইর ব্যবসা, মা এককালে ছিলেন রাঁধুনি। শৈশব কাটল জুরার মাঠে ও জঙ্গলে। "বারো বৎসর আমার জীবনের প্রায় সবটাই কেটেছে গ্রামে, গরু চরান বা ঐরকম ছোটখাটো কাজে।" ছেলেবেয়সের স্মৃতিতে কায়েম হয়ে বসল মাটির টান। "প্রায়ই জুন মাসের উষ্ণ প্রভাতে আমি কাপড়চোপড় খুলে ফেলে ঘাসের শিশিরে গড়াগড়ি দিতাম।" ছেলে মানুষ হল প্রকৃতির কোলে, তার জীবনবোধ বন্ধমূল হল চাষীর নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায়।

তারপর এল শহরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভাব অনটন। গ্রামের গরীব ছেলে বেসাঁসঁর কলেজে ভর্তি হল, বেতন মাপ হল কিন্তু বই কিনবার পয়সা নেই। সে খবর কে রাখে? বই জোটে না তাই পড়া হয় না, ক্লাসে শাস্তি পেতে হয়। এদিকে বাপ মা অনাহারে। উনিশ বৎসর বয়সে কলেজ ছেড়ে প্রুদঁ এক ছাপাখানায় চাকরি নিলেন। এখন থেকে তাঁর লেখার বাতিক দেখা দিল। ১৮৩০ সালে শুরু হল তাঁর ভবঘুরের যাত্রা। "পকেটে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক, পিঠে একটা ঝোলা, আর আমার দর্শনের পাণ্ডুলিপি, এই সম্বল করে আমি ফ্রান্সের দক্ষিণ দিকে বেরিয়ে পড়লাম।" পথে পথে ছাপাখানার কাজ করে খাওয়াপরা জুটত। অবসর পেলেই পড়াশুনা করতেন, কারণ সাধ ছিল নিজের ভবিষ্যতকে অন্যভাবে তৈরী করবার। বছর কয়েক পরে দেশে ফিরে নিজে ছাপাখানা খুললেন। বেশীদিন এ ব্যবসা চলল না। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী এবার মুখ তুলে চাইলেন। ১৮৩৮ সালে তাঁর রচনার গুণে বেসাঁসঁর কলেজ থেকে প্রুদঁকে তিন বছরের জন্য একটা বৃত্তি দেওয়া হল। এই উপলক্ষে নানা জনের কাছ থেকে অভিনন্দন এল। উত্তরে প্রুদঁ তাঁর সম্বর্ধনা সভায় ঘোষণা করলেন যে তিনি জীবন উৎসর্গ করবেন আপন সগোত্র দুর্গত শ্রেণীর কল্যাণের জন্যে। এ প্রতিশ্রুতি তিনি কোনোদিন ভোলেন নি। নিজের সাহিত্যপ্রতিভা ও রচনাশক্তি বিকিয়ে তিনি আরামে জীবন কাটিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি বেছে নিলেন জন্মসঙ্গী দারিদ্র্যকে এবং আজীবন লড়লেন দরিদ্রের হয়ে।

প্রুদঁ ছিলেন একান্ত নিষ্ঠাবান নীতিবান সৎ ব্যক্তি। তাঁর লেখা সর্বত্র সংযত, মার্জিত ও নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু মার্ক্‌স্‌ ও বাকুনিনের মত তাতে গা-এর ঝাল নেই। ১৮৪৯

[১] ওয়েল্‌থ্‌ অব নেশন্‌স্‌, খণ্ড ২, ২০৭ পৃষ্ঠা।

সালে একটি প্রবন্ধে ফ্রান্সের একনায়ক লুই নেপোলিয়নের সমালোচনা করার অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড হয়। জেলে থাকতে তিনি একটি বিত্তহীন যুবতীকে বিবাহ করেন। বেরিয়ে আসার কিছু পরে আবার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রস্তুত হল। প্রুদঁ বেলজিয়ামে পালিয়ে গেলেন। ১৮৬৩ সালে রাজবন্দীদের ওপর সম্রাটের রোষ প্রশমিত হলে তিনি দেশে ফিরলেন। তাঁর দেহ তখন ভাঙতে শুরু করেছে। দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর ১৮৬৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী পোয়াসীতে প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীর বাহুবন্ধনে তাঁর প্রাণবিয়োগ হল।

প্রুদঁর প্রধান এবং প্রথম রচনা—কেস্‌ক্‌ লা প্রপ্রিয়েতে? (১৮৪০) অর্থাৎ "সম্পত্তি কি?"—বইয়ের নামকরণ প্রশ্নে, মুখবন্ধ উত্তরে—উত্তর, সম্পত্তি চোরাই মাল। বুর্জোয়া বন্ধুদের চমক ভাঙতে ১৮৪৬ সালে বেরুল হেগেলের দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিতে সম্পত্তিগত অর্থনীতির বিচার—সিস্‌তেম দে কঁতাদিক্‌শিয়ঁ একনমিক ("অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের ধারা") নামক পুস্তকে। ১৮৪৮ সালে বিপ্লবের সময়ে দুইটি পুস্তিকায় তিনি নির্বিত্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা দিলেন। কারাবাসের অবকাশে তিনি লিখলেন লে কঁফেসিয়ঁ দ্যঁ রেভ্‌লাদ্‌শিয়নের ("বিপ্লবীর আত্মজীবনী," ১৮৪৯) এবং ইদে জেনেরাল দ্য লা রেভ্‌লাদ্‌শিয়ঁ ও দিজ্‌ নৌভিয়েম সিএক্‌ল্‌ ("উনিশ শতকের বিপ্লবের মূল আদর্শ," ১৮৫৯)। ১৮৫৮ সালে তিন খণ্ডে বেরুল চার্দ্রোহী তাঁর বৃহত্তম গ্রন্থ—দ্য লা জুস্‌তিস্‌ দাঁ লা রেভ্‌লুশিয়ঁ এ দ লেগ্‌লিজ ("বিপ্লব এবং চার্চের ন্যায়নীতি প্রসঙ্গে")। ১৮৬৩ সালে দ্যু প্রাঁসিপ ফেদেরাতিফ ("ফেডারেশনের নীতি") পুস্তিকায় নিরাজ সমাজের রূপরেখা আঁকা হল। তাঁর শেষ গ্রন্থ দ্য লা কাপাসিতে পলিতিক দে ক্লাসে জুভ্‌রিয়েরে ("শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি") তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হল। এতে তিনি ভবিষ্যতের রচয়িতা জাগ্রত শ্রমিক শ্রেণীকে আশীর্বাদ জানালেন।

প্রুদঁ আত্মজীবনীতে বলছেন হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ থেকে তিনি কি সূত্র উদ্ধার করেছেন—

> যে কোনো তত্ত্বকে তাহার শেষ পরিণাম পর্যন্ত লইয়া গেলে দেখা যায় যে তাহা এক অসঙ্গতিতে উপনীত হইয়াছে। তখন এ তত্ত্বকে অসত্য ও খণ্ডিত বলিয়া মানিতে হইবে এবং এই অসত্য যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়া থাকে তবে তাহাকেও কৃত্রিম ও কাল্পনিক বস্তু বলিয়া মনে করিতে হইবে।

এই নাশাত্মক নিয়ম জীবন ও গতির নিয়ম। একে ধরেই জীবনপথে এগিয়ে যেতে হবে। এই নিয়মটি সমাজসমস্যার চাবিকাঠি, এই নিয়ম খাটিয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে সমাজ-ব্যাধির ধন্বন্তরী। এই অস্ত্র হাতে নিয়ে তিনি সমাজের আসল রোগ সম্পত্তিপ্রথার উপচারে অগ্রসর হলেন। দ্বন্দ্ববাদে কল্পনাবিলাসের জায়গা নেই। সমাজ একটা যন্ত্র নয় যা বুদ্ধি খাটিয়ে মেরামত করে চালানো যাবে। সমাজ জৈবধর্মী, তার জীবন নিরন্তর গতিশীল।

> এই ধারণা যদি আমরা শ্রমসংগঠনে প্রয়োগ করি তাহা হইলে অর্থশাস্ত্রী ও সমাজবাদী কাহারও সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারি না। অর্থশাস্ত্রী বলে শ্রম ঠিক ঠিক সংগঠিত হইয়া গিয়াছে, সমাজবাদী বলে শ্রমকে আদর্শ মাফিক

> সংগঠন করিতে হইবে। বস্তুত শ্রম ক্রমশ সংগঠিত হইয়া চলিয়াছে।[২]

ব্যক্তিসম্পত্তির ভিত্তির ওপর যে অর্থনৈতিক কাঠাম তৈরী হয়েছিল বনেদী অর্থ-শাস্ত্রীদের ধনবিজ্ঞান ছিল তার পক্ষে ওকালতি। আর সমাজবাদীরা চাচ্ছিল ব্যক্তিসম্পত্তির উচ্ছেদ করে ধনবৈষম্যের নিরসন এবং সামাজিক ধনবিজ্ঞানের প্রবর্তন। প্রুদঁ এদের কারও পক্ষপাতী ছিলেন না।

যে সম্পত্তিকে প্রুদঁ চোরাই মাল বলে আক্রমণ করলেন, তাকেই আবার মুক্তির দিশারী বলে অভিনন্দন করলেন। এই হেঁয়ালিটা বোঝা কিছু কঠিন নয়। মালিক যখন কোন কাজ না করে আয়ের অধিকারী হয়, তখন বস্তুত সে অপরের পরিশ্রমের রোজগারের ওপর ভাগ বসায়। জমি ও পুঁজি কিছু উৎপাদন করতে পারে না। উৎপাদন করে শ্রম। যখন জমিদার ও পুঁজিপতি লাভের অংশ দাবি করে তখন তারা কিছু চায় যার বদলে কিছু দেয় না। এটাই হল অনর্জিত আয় বা চোরাই মাল। সম্পত্তি হল,

> অপরের উদ্যোগ অথবা মেহনতের ফল ভোগ করিবার এবং সেই ফলকে নিজের খুশি মত বেচাকেনা করিবার অধিকার।[৩]

নিজের শ্রমফলের ওপর প্রত্যেকের দাবি অবিসংবাদিত, প্রত্যেকের অধিকার আছে নিজের শ্রমফল বাজারে ইচ্ছামত বিনিময় করবার। মেহনত করে যে যা গড়েছে কিংবা সঞ্চয় করেছে সে তা ভোগ করবে, দান করবে, বিক্রি করবে যেমন তার খুশি এই বিত্তাধিকার স্বাধীনতার গোড়ার কথা। এ হিসাবে সম্পত্তি মুক্তির দিশারী।

মজুরের পরিশ্রমের আয় কেমন করে মালিকের পকেটে যায়? একক ব্যক্তির মেহনতের ওপর যৌথ উদ্যোগের যে উদ্বৃত্ত আয় সেটি চুরি করে,—মালিক যাকে বলে মুনাফা।

> বহুলোকের এককালীন সংঘবদ্ধ উদ্যম হইতে যে বিরাট শক্তির উদ্ভব হয় তাহার দাম সে কিছু দেয় না। দু-শ' মজুর লুক্সরের প্রকাণ্ড মূর্তিটিকে কয়েক ঘণ্টায় তুলিয়া ফেলিতে পারে, যাহা একজন মজুর দু'শ' দিনেও পারিবে না। ধনিকের হিসাব মত উভয় ক্ষেত্রেই মজুরি হইবে সমান।[৪]

মজুর মনে করে সে তার কাজ মত মজুরি পেল। আসলে সে পেল কাজের আংশিক মূল্য।

এর পর প্রুদঁ সমাজবাদীদের ধরলেন। সম্পত্তি অর্জন, প্রতিযোগিতা, ভোগ, এসব মানুষের মজ্জাগত প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তিগুলি ধনসৃষ্টির উৎস। এ উৎস সমাজবাদীরা বুজিয়ে দিতে চায়।

> শ্রমবিভাগ, যৌথশক্তি, প্রতিযোগিতা, বিনিময়, বিত্ত, এমন কি স্বাধীনতা ইহারাই হইল আসল অর্থনৈতিক শক্তি, ধনসৃষ্টির উপাদান। ইহারা মানুষকে অপরের দাস বানায় না, পরন্তু উৎপাদককে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, তাহার পরিশ্রম লাঘব করে, তাহার উৎসাহ জাগাইয়া তোলে, তাহার উৎপাদনকে দ্বিগুণ করে।[৫]

এই অর্থনৈতিক প্রথা ও প্রবৃত্তিগুলোকে নষ্ট করা সমাজবিপ্লবীর কাজ নয়, এদের অন্তর্বিরোধের মীমাংসা করা তার কাজ। তার কাজ এদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা।

---

[২] কঁত্রাদিক্শিয়ঁ একনমিক, খণ্ড ১, ৪৫ পৃষ্ঠা।
[৩] প্রপ্রিয়েতে? অধ্যায় ১, ১৩৩ পৃষ্ঠা।
[৪] প্রপ্রিয়েতে? অধ্যায় ১, ৯৪ পৃষ্ঠা।
[৫] ইদে জেনেরাল, ৯৫ পৃষ্ঠা।

> এই অর্থনৈতিক প্রভাবগুলি, যাহার শক্তি এত ফুলিয়া উঠিয়াছে সেগুলিকে দমন করার পরিবর্তে আমাদের উচিত তাহাদের পরস্পরে একটা ভারসাম্য আনা। ইহা সম্ভব হইবে সেই নিয়মের বলে যাহা অনেকেই ভাল করিয়া জানে না বা বোঝে না—যে বিপরীত বস্তু পরস্পরকে বিনাশ করা দূরের কথা, বরং তাহাদের বিপরীত স্বভাবের জন্যই পরস্পরকে রক্ষা করে।[৬]

খুব সহজ তত্ত্ব। বাড়ির খিলান ও গম্বুজ তৈরী হয় ভিন্নমুখী ভারের সমন্বয় করে—বিপরীত ভার পরস্পরকে ঠেকিয়ে রাখে, কেহই ভূমিসাৎ হয় না। বলবিদ্যার এই নিয়ম সমাজেও বলবৎ।

সমাজবাদী চায় সব বৈপরীত্য নিঃশেষ করে যৌথ উদ্যোগের প্রবর্তন। তার মানে স্বাধীনতার সৎকার।

> সামুদায়িকতার অর্থ প্রত্যেকে অপরের জন্য দায়ী এবং অক্ষম ও সক্ষম, তরুণ ও বৃদ্ধ সকলের কদর সমান। ইহাতে অসাম্য দূর হয় বটে কিন্তু অযোগ্যতা ও অক্ষমতা প্রশ্রয় পায়।[৭]

সুতরাং ব্যক্তিসম্পত্তির মত যৌথসম্পত্তিও বর্জনীয়।

> হেগেলের ছকে ফেলিয়া বলিতে গেলে সমাজবিকাশের প্রথম পর্যায়ে আসে যৌথ সত্তা, এটি হইল থীসিস বা ভাব; ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আসে ব্যক্তি-সম্পত্তি, এটি হইল এণ্টিথীসিস বা প্রতিভাব। সমাধানে পৌঁছাইবার আগে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে তৃতীয় পর্যায়ের সিন্থেসিস বা সদ্ভাবটিকে।[৮]

এই সিন্থেসিস বা সমন্বয়টি কী? বিত্ত থাকবে শ্রমের স্বাধীনতা ও বিনিময়ের অধিকার নিয়ে। কিন্তু বিত্তের আনুষঙ্গিক যে অনর্জিত লাভের দাবি তা বাতিল হবে। নিজের শ্রমফল ভোগ করবার অধিকার হবে সম্পত্তির মর্ম। একে অন্যের চাহিদা মেটাবে, পরস্পরের সাহায্যের জন্যে গড়ে উঠবে বিনিময় প্রথা, সম্পত্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের এই হল সমাধান। ব্যক্তিসম্পত্তি নয়, যৌথসম্পত্তি নয়,—ব্যক্তি অধিকার ও সহযোগিতা এতে হবে সমাজদ্বন্দ্বের নিরসন—যাকে প্রুদঁ বলেছেন ম্যুতুয়ালিতে।

সমস্যাটা অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক নয়। রাষ্ট্রবিপ্লবে এর সমাধান নেই। তাই ১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লব প্রুদঁর মনে সাড়া জাগাতে পারেনি। এ যেন অকালপ্রসূত ভ্রূণ সন্তান। কিন্তু একে এড়িয়ে যাবারও যো নেই। এতদিন চলেছে কেবল সমালোচনা ও দার্শনিক তত্ত্বকথা। এবার বিপ্লবের তাড়ায় কাজের রাস্তা খুঁজতে হল, আবিষ্কার করতে হল এমন কর্মপন্থা যাতে ধনবৈষম্য দূর হয়।

প্রুদঁ বের করলেন বিনিময় ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা। তিনি দেখালেন এতদিন সম্পত্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে এর মারফত ধন উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপারে মালিকের ক্ষমতা বর্তায় বলে। বিনিময়ের মধ্য দিয়েও যে বৈষম্য আসতে পারে এবং প্রধানত আসে তা কেউ খেয়াল করেনি। বিনিময়ের মাধ্যম হল মুদ্রা। যে কোনো উৎপাদনের কাজে মুদ্রার দরকার। মূলধনের জন্যে চাই সুদ, জমি ও যন্ত্রের জন্যে চাই ভাড়া, সব দিতে হয় মুদ্রায়। এই প্রকারে মুদ্রা হয়ে দাঁড়ায় অনর্জিত আয়ের বাহন, পরস্বভোগের হাতিয়ার। মুদ্রার এই

---

[৬] দ্য লা জুস্তিস, খণ্ড ১, ২৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা।
[৭] ইদে জেনেরাল, ৮৯ পৃষ্ঠা।
[৮] প্রপ্রিয়েতে? অধ্যায় ১, ২০২ পৃষ্ঠা।

পাপবৃত্তি যদি দূর করা যায়, যদি শ্রমিক বিনা সুদে পুঁজি ও বিনা ভাড়ায় জমি পায় তাহলে সে তার পরিশ্রমের ফল পুরোপুরি ভোগ করতে পারে এবং পুঁজিপতি তাতে ভাগ বসাতে পারে না।

বিনিময় ব্যাঙ্কের কাজই হবে এই। এই ব্যাঙ্ক উৎপাদনকারীকে বিনা সুদে ধার দেবে। চলতি ব্যাঙ্ক পুঁজিবাদীদের ঘাটি। এর কাজ পণ্যের বদলে কিছু বাটা রেখে মুদ্রা অথবা হুণ্ডি দেওয়া এবং এই বাটার আয় ব্যাঙ্কের মূলধনের অংশীদারদের মধ্যে বিলি করা। বিনিময় ব্যাঙ্কের কোন মূলধন ও অংশীদার থাকবে না এবং এ কোন লাভ করবে না। পণ্যের বদলে এই ব্যাঙ্ক দেবে হুণ্ডি কিংবা নোট যা মুদ্রায় রূপান্তরিত করা যাবে না। নোটগুলি ব্যাঙ্কের মক্কেলদের মধ্যে বিনিময়ে হবে এবং কারেন্সি নোটের মত চলবে। মক্কেলদের মধ্যে বোঝাপড়া থাকবে যে তারা তাদের পণ্যের দাম বাবদ এই নোট নিতে আপত্তি করবে না। ব্যাঙ্ক সাধারণত পণ্যের বদলে নোট দেবে, দাম স্থির হবে উৎপাদনের খরচ ও মেহনতের অনুপাতে। কেউ যদি নূতন কারবার অথবা কারখানা খুলতে চায় তাহলে ব্যাঙ্ক তাকে কিছু আগাম টাকা কিংবা নোটও দিতে পারবে, পরে তার উৎপন্ন পণ্য নিয়ে এই ধার উসুল করবে। এইরূপে কারবারিরা বিনা সুদে মূলধন পাবে। মূলধনের অভাবে উৎপাদককে ধনিকের দাসত্ব করতে হয় কিংবা তাকে মোটা হারে জমি ও যন্ত্রের ভাড়া দিতে হয়। বিনিময় ব্যাঙ্কের সাহায্যে সে নিজে যন্ত্র কিনে তার মালিক হতে পারবে এবং নিজের মেহনতের রোজগার সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারবে।

মূলধন প্রত্যেকের আয়ত্তের মধ্যে এলে কোন উদ্যোগী লোককে বেকার থাকতে হবে না। পণ্যের ন্যায্য বিনিময় এবং উৎপাদকদের স্বাধীন চুক্তি, এই হবে বাজারের রেওয়াজ, শ্রম ও পুঁজি এক পাত্রে এসে মিলবে, শোষণ ও শ্রেণীভেদ দূর হবে। সমাজ হবে শাসনমুক্ত, স্বাবলম্বী।

পরিকল্পনাটি সুন্দর, কিন্তু এতে কিছু গলদ আছে, যা রচয়িতার নজরে পড়েনি। তিনি দেখেছেন বিনিময় নোটে বিক্রেতাদের মস্ত সুবিধে যে এতে বাটা নেই। ব্যাঙ্ক নোট বাটা নেয়। ব্যাঙ্ক নোটের সুবিধের দিকটা তিনি দেখেন নি। ব্যাঙ্ক নোট ইচ্ছামত মুদ্রায় ভাঙানো যায়। সুতরাং ব্যাঙ্ক নোট লেনদেনের ব্যাপারে সকলেরই গ্রাহ্য। বিনিময় নোট মুদ্রায় ভাঙানো যায় না। এ কেবল ব্যাঙ্কের মক্কেলদের কাছে গ্রাহ্য। কাজেই এর চলাচল নির্ভর করে মক্কেলদের সচ্ছলতার ওপর। তাদের কারবারে মন্দা পড়লে বিনিময় নোটের কদর কমে যাবে। তাই ব্যাঙ্ক নোটের মত বিনিময় নোটের ওপর জনসাধারণের আস্থা আসতে পারে না। আরও একটা কথা আছে। মূলধন তৈরী হয় এবং সমাজের ধনবৃদ্ধি হয় সঞ্চয় থেকে। তার মানে সম্পদের সৃষ্টি বাড়ানো দরকার, ভোগ কমিয়ে উদ্বৃত্ত সম্পদ জমিয়ে আবার উৎপাদনে খাটানো দরকার। এই প্রকারে সমাজের বিত্ত বৃদ্ধি পায়। এর আয়োজন না করে কেবল বিনিময়ের সুবিধা ও ঋণের সুযোগ দেবার জন্যে নোট ছাড়লে বাজার ফেঁপে উঠবে, জিনিসপত্রের দাম চড়বে।

এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও বিনিময় ব্যাঙ্কের পরিকল্পনায় একটা খুব কাজের কথা আছে—সে হল পারস্পরিক ঋণের ব্যবস্থা। জনসাধারণের টাকায় ব্যাঙ্ক চলে। ব্যাঙ্ক একজনের টাকা গচ্ছিত রাখে, সে টাকা লগ্নি করে আর একজনের কাছে। ধার দেয় একজন আর একজনকে, ব্যাঙ্ক শুধু মধ্যস্থ। অংশীদারদের দেওয়া মূলধন একটা অতিরিক্ত নির্ভর, আপৎকালের ভরসা।

এখন ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতা কি তুলে দেওয়া যায় না? বিলক্ষণ যায়। সমবায় সমিতি দোকানদারকে বাদ দিয়ে সভ্যদের বিনা লাভে জিনিস যোগায়। তেমন সমবায় ঋণ সমিতি ব্যাঙ্ককে বাদ দিয়ে সভ্যদের বিনা সুদে ধার দিতে পারে। এতে বেশী মূলধন লাগবে না। সভ্যদের চাঁদায় কাজ চলে যাবে এবং ব্যাঙ্কের দায় হবে সভ্যদের যৌথ।

"উনিশ শতকের বিপ্লবের মূল আদর্শ" গ্রন্থে প্রুদঁ সরাসরি এই সমবায় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব দিলেন। সে ১৮৫১ সালে, বিনিময় ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টা বানচাল হবার পর। ১৮৪৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী, প্রুদঁ 'বাঁক দু প্যেপ্‌ল্‌' বা 'জনতা ব্যাঙ্ক' নাম দিয়ে তাঁর কল্পনাকে রূপায়িত করলেন। মূল পরিকল্পনার কিছু কিছু অঙ্গ অবশ্য বাদ দিতে হল। কিছু মূলধন শেয়ার ছেড়ে যোগাড় করতে হল, শতকরা দুই হারে সুদ ধার্য হল এবং কয়েকটি মাত্র জিনিসের লেনদেনে বিনিময় নোট চালু হল, বাকি জিনিসগুলির বেচা-কেনায় মুদ্রা বহাল রইল। এই সঙ্কুচিত পরিধির মধ্যেও ব্যাঙ্কের কাজ চলল না। ১১ই এপ্রিল কারাগমনের আগে প্রুদঁ ব্যাঙ্কের পাট তুললেন। মুদ্রার বদলে বিনিময় নোটের পরিকল্পনার এইখানেই সমাপ্তি।

প্রচলিত অর্থে প্রুদঁ আদৌ সমাজবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন খাঁটি ব্যক্তিবাদী। তিনি খুঁজেছেন এমন একটা সমাধান যাতে কারও স্বাধীনতা খর্ব না হয় অথচ সকলের ন্যায়সঙ্গত পাওনা ঠিক থাকে, যাতে সবাই স্বাধীনভাবে ও ন্যায্যভাবে আপন আপন কাজ নিয়ে লেনদেন করতে পারে, প্রত্যেকে যা দেয় ঠিক তার সমান পায়, কারও কোনো একাধিকার অথবা মধ্যস্বত্ব নেই। এই হল প্রুদঁর মাতুয়ালিতে বা সহযোগী স্বেচ্ছাতন্ত্র যেখানে যৌথসমাজের কোনো রকম জোর জুলুম খাটে না।

এই বন্দোবস্তে রাষ্ট্রশাসনের কোনো জায়গা নেই। সমাজ স্বন্দ্বে ভরপুর। কত বিরোধী অধিকার দাবিদাওয়া পরস্পরকে ঠেকিয়ে রেখেছে এবং আপোসে এসেছে, তাদের সংঘাত থেকেই এসেছে সমন্বয়। অধিকারের রক্ষাকর্তা অধিকার নিজেই। রাষ্ট্রের উদ্যত মুষ্টির কি প্রয়োজন?

এইখানেই প্রুদঁর সঙ্গে সমাজবাদীদের বিবাদ। শ্রমিক তার শ্রমের পূর্ণ ফল ভোগ করবে এবং এই উদ্দেশ্যে আর্থিক সংস্কার হবে—এ বিষয়ে উভয়ে একমত। কিন্তু লুই ব্লাঁক প্রমুখ সমাজবাদীরা চাইতেন রাষ্ট্রের আশুতায় এই পরিবর্তন আনতে। আর প্রুদঁ চাইতেন জনসাধারণের স্বেচ্ছাকৃত উদ্যোগে এই সংস্কার আপনি আসুক। বিপ্লবের লক্ষ্য জনকল্যাণ নয়, জনমুক্তি স্বাধীনতা। সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হলে যেমন শোষণ চলে, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে তেমন শাসন চলে। দুয়েরই উচ্ছেদ করা বিপ্লবীর লক্ষ্য।

১৮৪৮-এর বিপ্লবে রাজতন্ত্র উচ্ছন্ন হল, প্রজাতন্ত্র প্রবর্তিত হল কিন্তু বিপ্লব দায়মুক্ত হল না। তার যে প্রতিশ্রুতি নূতন সমাজসম্পর্ক, স্বাধীন জীবনযাত্রা তা পূর্ণ হল না। প্রুদঁ তখন "প্যেপ্‌ল্‌" বা "জনতা" পত্রিকার সম্পাদক এবং গণপরিষদে সাইন জেলার প্রতিনিধি। অস্থায়ী সরকার প্রথমেই সর্বসাধারণকে ভোটাধিকার দিল। সবাই যখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রুদঁ বললেন এ বিধান প্রতিবিপ্লবী। প্রজাতন্ত্রীরা তো অবাক, বিপ্লবী প্রুদঁ বলে কি? পরে "বিপ্লবের মূল আদর্শ" পুস্তকে তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে তাঁর উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। গণভোটে অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হল প্রতিক্রিয়াশীল দলের লোক, যারা সবরকম সমাজসংস্কারের বিরোধী। কারণ ভোটের পরিচালনা ছিল এদের হাতে।

মেকি প্রজাতন্ত্র বেশীদিন টিকল না। ফ্রান্সের আকাশে ধূমকেতুর মত উদিত হলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন, গণভোটের জোরে প্রজাতন্ত্র ভেঙে দিয়ে প্রথমে হলেন একনায়ক তারপর সম্রাট। এই ভুঁইফোড় জনপ্রিয় সম্রাটকে লক্ষ্য করে প্রুদঁ লিখলেন "জনতাকে দিয়ে মিথ্যাচার করাবার শ্রেষ্ঠ উপায় সার্বজনীন ভোটাধিকার।" প্রভুভক্তির দাস্যভাব জনতার অস্থি মজ্জায়। তিনি প্রায়ই বলতেন, "বাস্তবপক্ষে জনতার চেয়ে অগণতান্ত্রিক আর কিছু নয়।" সুতরাং আইন ও বিধান দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। বিপ্লবের পরাহ্নে গণপরিষদ যখন প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করছিল, তখন প্রুদঁ দাঁড়িয়ে বললেন :

> আমি সংবিধানের বিরুদ্ধে ভোট দিতেছি ইহাতে আমার অসমর্থনীয় বিধি আছে বলিয়া নয়, ইহাতে আমার সমর্থনীয় বিধি নাই বলিয়াও নয়। আমি সংবিধানের বিরুদ্ধে ভোট দিতেছি কারণ ইহা একটি সংবিধান।

গডউইনের মত তিনিও মনে করতেন সংবিধান মাত্রই দুষ্ট, পরিত্যাজ্য। ফ্রান্সের তথাকথিত উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না।

> শুরুতে যতই জনপ্রিয় হউক, সরকার সর্বত্র দরিদ্র অশিক্ষিত জনতার বিরুদ্ধে শিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন শ্রেণীর পক্ষ লইয়াছে।[৯]

সমাজে বিপ্লব সাধন করা রাষ্ট্রের পক্ষে কোনো কালে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রজীবনের দুই বিপরীত প্রেরণা মুক্তি ও শৃঙ্খলা। বিপ্লব চায় প্রথমটি, সরকার চায় দ্বিতীয়টি। সরকার তার স্বভাবধর্মবশত বিপ্লবী হতে পারে না। আদিমতম নৃপতির রাজ্যাভিষেক থেকে ১৭৮৯ সালে মানবাধিকারের ঘোষণা পর্যন্ত যাবতীয় বিপ্লব ঘটেছে জনতার উদ্দীপনায়। সরকার শুধু বাধা দিয়েছে, পীড়ন করেছে। সরকার চিরকাল রক্ষণধর্মী। জনতা বিপ্লবকামী। স্বেচ্ছায়, স্বচেষ্টায় তারা যখন বিপ্লব আনবে তখনই বিপ্লব সার্থক হবে। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব এনেছেন কয়েকজন উপরতলার নেতা। তাঁরা ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন এবং বিপ্লব পঞ্চত্ব পেয়েছে।

সে কালের রাষ্ট্রচিন্তায় যে দুটি ইষ্টমন্ত্র ছিল জাতীয়তা ও গণতন্ত্র—তার কোনোটিতে প্রুদঁর কোনো মোহ ছিল না। ম্যাট্‌সিনির জাতীয়তার আবেদনে সারা ইয়োরোপের তরুণ জেগে উঠেছিল, প্রুদঁর রক্তে কোনো ঢেউ লাগেনি। হাঙ্গারী ও পোল্যাণ্ডের ওপর জারের অত্যাচারে তাঁর বিবেকবুদ্ধিতে আঁচড় পড়েনি। কারণ তাঁর মতে জাতীয়তার নেশা বড় মারাত্মক। আজকের নির্যাতিত পরাধীন জাতি কাল স্বাধীন হয়ে বসলে এক কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্র গঠন করবে এবং নির্যাতনে হাত পাকাবে। তার চেয়ে বরং ঢিলেঢালা অস্ট্রিয় সাম্রাজ্য ভাল যার অধীনে অনেক জাতি উপজাতির বাস। ফ্রান্সে যে বহু ফ্লেমিং, জার্মান, ইটালীয় ও বাস্ক জাতির লোক আছে এও মন্দ নয়, এদের জন্যে ফ্রান্স জাতিসর্বস্ব হতে পারে না। বহুজাতির শিথিল রাষ্ট্রের মধ্যেই নিহিত আছে তার ভাঙনের বীজ এবং জনতার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনা।

রাষ্ট্রের বিকল্প এই প্রতিষ্ঠানের রূপটি কী? "আত্মজীবনী" এবং "ফেডারেশনের নীতি" এই দুই পুস্তকে প্রুদঁ নিরাজ সমাজব্যবস্থার ছক এঁকেছেন। সমাজের যে সকল কাজকারবার সরকারী তত্ত্বাবধানে চলছে সেগুলোকে পরস্পর থেকে পৃথক করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেমন যেখানে দরকার তেমন সেখানে আঞ্চলিক সভা গড়ে উঠবে,

[৯] ইদে জেনেরাল, ১১৯ পৃষ্ঠা।

তারা স্থানীয় কাজকর্ম চালাবে—বৃহত্তর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে এবং প্রয়োজনমত উচ্চতর সভা গড়ে তুলবে। কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা, অর্থ, বিচার, দেশরক্ষা ইত্যাদি যে সমস্ত কাজের দেখাশুনা এখন সরকারী দপ্তর থেকে হয় সব তদারক করবে জনসাধারণ অথবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। সরকারী কর্মচারী কিংবা সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি কোথাও থাকবে না। শৃঙ্খলা ও পরিচালনা থাকবে, বৈধানিক কর্তৃত্ব উঠে যাবে।

কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদির পরিচালনার জন্য সমব্যবসায়ীরা নিজ নিজ সংঘ গড়ে তুলবে। সংঘের থাকবে আলোচনা সভা ও কার্যকরী সভা, মাথার ওপর থাকতে পারে একজন নির্বাচিত সচিব। এরাই সব কাজ চালাবে। কি দরকার সরকারী কৃষি দপ্তর ও বাণিজ্য দপ্তরের? খনি ইজারা দেওয়া, রেলগাড়ি চালানো, খাল কাটা, রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ ইত্যাদি সব আসবে জনসভার এক্তিয়ারে। এ সকল ব্যবসায়ের ও জনহিতের কাজ সরকারের হাতে থাকা মানে কতগুলো ঠিকাদার, সুদখোর ও ফাট্‌কাবাজের পকেটে টাকা ঢালা যে টাকা খেটে খাওয়া মজুরের পাওনা।

জনশিক্ষা বিভাগে শিক্ষকরা নির্বাচিত ও নিযুক্ত হবে পৌরসভা বা অঞ্চল সভা থেকে। ডিগ্রী দেবে বিশ্ববিদ্যালয়। যেমন সেনাবিভাগে রেওয়াজ আছে তেমন শিক্ষাবিভাগেও যোগ্যতা হবে উন্নতির সোপান। নীচের ক্লাসে পড়িয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পারলে তবে শিক্ষক কলেজে ও ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করবার সুযোগ পাবে।

অর্থদপ্তরটিকে লোকায়ত্ত করার যুক্তি আরো জোরাল। যে কোন কাজ চালাতে হলে টাকার দরকার এবং টাকা যোগায় করদাতা। যারা টাকা দেয় তাদের হাতেই জমাখরচ থাকা উচিত, যারা টাকা ওড়ায় তাদের হাতে নয়। অর্থাৎ আয়ব্যয়ের নীতি ঠিক করবে দেশ, সরকার নয়। জনতার অর্থভাণ্ডার থেকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সরিয়ে দিলে অপচয়, ঘাটতি এবং দুর্নীতি অনেক কমে যাবে।

জনস্বার্থের কাজগুলি পৃথকভাবে সংগঠিত হবার পর তাদের নির্বাচিত প্রধানরা এক যুক্তসভায় মিলিত হবে। এই যুক্তসভা রাষ্ট্রসভার জায়গা নেবে। এর কাজ হবে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগ রক্ষা করা। এর ওপর গোটা দেশের নির্বাচিত একটি জাতীয় সভাও থাকতে পারে—যার কাজ হবে আইন প্রণয়ন, হিসাব পরীক্ষা, আন্তর্বিভাগীয় বিবাদের নিষ্পত্তি। এই ব্যবস্থায় একদিকে যেমন আছে স্বাধীনতা ও লোকায়ত্ত সংগঠন অন্যদিকে তেমন আছে দায়িত্বশীলতা ও কেন্দ্রীকরণ। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে এই বিধান হবে রাষ্ট্রবিধানের চেয়ে শক্তিশালী।

ফেডারেশন বা যুক্তকরণের নীতির ওপর নির্মিত এই হল প্রুদঁর নিরাজ সমাজের স্বপ্নসৌধ। ছোট ছোট আঞ্চলিক কেন্দ্রের স্বেচ্ছাকৃত সংযোজনে গাঁথা হবে বৃহত্তর কেন্দ্র—সুদৃঢ় লোকভিত্তির ওপর দাঁড়াবে সমাজব্যবস্থার শীর্ষচূড়া। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পুরোধা জিরোঁদাঁ দলের কাছ থেকে পাওয়া এই বিকেন্দ্রন ও স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনাকে প্রুদঁ একটি নিঃশাসন নিরাজ সমাজের চেহারা দিলেন।[১০] এই রূপায়ণকে আশ্রয় করে অগ্রসর হল উনিশ শতকের নৈরাজ্যবাদ।

[১০] জিরোঁদাঁ দলের চিন্তানায়ক ভার্জিনো ও ব্রিসো এই পরিকল্পনার স্রষ্টা। এঁরা নৈরাজ্যবাদী ছিলেন না। ব্রিসো তাঁর "রেশের্শ ফিলজফিক স্যুর ল দ্রোয়া দ্য প্রপ্রিয়েতে দা লা নাত্যুর" নামক পুস্তকে সম্পত্তিকে চৌর্য বলে অভিহিত করেছেন—যে সুন্দর কথাটা প্রুদঁর কলমে এসে চিরস্মরণীয় হল। লেকী : ডেমোক্রাসী এণ্ড লিবার্টী, খণ্ড ২, সোস্যালিজ্‌ম্‌।

ফয়েরব্যাক প্রমুখ হেগেলের জার্মান শিষ্যদের মত প্রুদঁ চার্চকেও আক্রমণ করলেন। তিনি চাইলেন ঐশ্বরিক নয়, মানবিক ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র। বেসাঁস'র কার্ডিন্যাল আর্ক-বিশপের উদ্দেশে লেখা "বিপ্লব ও চার্চের ন্যায়নীতি প্রসঙ্গে" বইতে তিনি চার্চকে দাসত্বের শিক্ষাগার বলে ধিক্কার দিলেন। পৃথিবীতে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা দূরে থাকুক, ধর্ম এক তুরীয় আদর্শবাদের নামে ধনের যারা স্রষ্টা তাদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে এসেছে। পাপের আতঙ্কে খ্রীষ্টানরা মানবজীবনকে ভেবেছে অশুচি, সহজ প্রবৃত্তিকে তারা দমন করেছে, শ্রমকে তারা বিধাতার অভিশাপ বলে অপমান করেছে। "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছি এবং বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি মানুষে।" খ্রীষ্টানদের ধর্ম "জনতার দারিদ্র্য, লোকের হতাশা এবং দাসদের অবনতির পরিচয়।" "খ্রীষ্টান ধর্মের যুগ মানবজাতির পতনের যুগ।" খ্রীষ্টানদের সন্ন্যাসবাদ ও যৌন দমন নারীর অমর্যাদা করেছে, বিবাহকে যথাযোগ্য সম্মান দেয় নি। খ্রীষ্টান ধর্মের দার্শনিক দোসর হল পরমাদ্বৈতবাদ। প্রুদঁ তার বইয়ের তৃতীয় খণ্ডে এক অধ্যায় জুড়ে এর অপপ্রভাবের বর্ণনা দিয়েছেন।[১১]

এতদিন সমাজ নৈতিক প্রেরণা পেয়েছে লোকোত্তর বাণী ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব থেকে। ফরাসী বিপ্লব এই বুজরুকির মুখোশ খুলে দিয়েছে।

> ভাল ও মন্দ, যার পার্থক্য আমরা আগে চলতি ছকে ফেলিয়া স্থির করিতাম, এখন তা অস্পষ্ট ও নিরাকার, দুটো বাঁধাধরা বুলি বই আর কিছু নয়। অধিকার, কর্তব্য, নীতিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি যার কথা প্রার্থনাসভায় ও বিদ্যালয়ে ফলাও করিয়া বলা হয়, সেগুলির এখন কাজ নিরালম্ব বাক্যজাল বিস্তার, অসার কল্পনা বিলাস এবং প্রমাণহীন সংস্কারকে আবরণ করা।[১২]

প্রুদঁ ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়তা থেকে মুক্ত এক লৌকিক নীতিমানের সন্ধান করছিলেন। তিনি এর উৎস খুঁজে পেলেন বিপ্লবের দেওয়া সামাজিক ন্যায়নীতির মধ্যে। ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) মানুষকে তার মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছে—এক নূতন ন্যায়ের বিধান এনেছে যা মানবমূল্যে অধিষ্ঠিত। এর ইঙ্গিতকে অনুসরণ করে সমাজের সকল ক্ষেত্রে আমাদের এই মানবিক নীতিমানকে প্রবর্তন করতে হবে।

প্রুদঁর রামরাজ্যে যে যার খুশিমত কাজ বেছে নেবে। বাজারে অবাধ বিনিময় চলবে—বিনা লাভে। কাজের পরিমাণ হবে বিনিময়ের হার। সমান পরিশ্রমের মাল সমানে সমানে বিনিময় হবে। যেখানে যে পণ্যের দরকার সেখানে সে পণ্য অবাধে চলাচল করবে, চাহিদা ও সরবরাহ সমান হবে। উৎপাদক-গোষ্ঠীগুলি সমস্বার্থে মিলিত হবে, বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করে তাদের দিয়ে আন্তর্গোষ্ঠিক কাজ চালাবে। সরকারী শাসন হবে অবান্তর। রাষ্ট্রীয় জীবন অর্থনৈতিক জীবনে মিশে যাবে। ধর্মীয় ব্যাপার লোকায়ত ব্যাপার থেকে পৃথক থাকবে। সমাজ নিজের চলৎশক্তিতে চলবে, সেনাবল বিচারশালা ও আমলাতন্ত্র দিয়ে তাকে চালাতে হবে না।

কেমন করে এমন আমূল পরিবর্তন সম্ভব হবে? ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে আসবে পরিবর্তন। জোর জবরদস্তি করে, হিংসাত্মক কাজের দ্বারা আচমকা সমাজের চেহারা বদলে দেওয়া যায় না। এই পরিবর্তন সাধনেই বিপ্লবের সার্থকতা, শুধু রক্তগঙ্গা বওয়ালে বিপ্লব হয় না।

---

[১১] এই পরমাদ্বৈতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্রুদঁর গুরু হেগেল।
[১২] দা লা জুস্তিস, খণ্ড ১, ৭০ পৃষ্ঠা।

> বিপ্লব জৈবশক্তির বিচ্ছুরণ। সমাজের অন্তঃস্থল হইতে তার বহুল নরনারীর মাধ্যমে ইহা প্রকাশিত হয়। স্বতঃস্ফূর্ত, শান্তিপূর্ণ এবং ক্রমগামী হইলেই তবে ইহা সমর্থনীয়। জোর করিয়া বিপ্লব ঘটানো জোর করিয়া বিপ্লব দমানোর মতই জুলুমবাজি।[১৩]

গডউইনের মত প্রুদঁরও বিশ্বাস ছিল যে ইতরজনের মনে বুদ্ধির আলো জ্বলে উঠলে আপনিই পরিবর্তন আসবে, বিপ্লবের ভার তারা নিজ হাতে নেবে।

> সমাজ ও প্রকৃতি যে সকল নিয়মে চালিত হয়, যে নিয়ম অনিবার্য ও অবধার্য, প্রজ্ঞান অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেই নিয়মের স্বরূপ আমাদের সামনে মেলিয়া ধরে। এ নিয়ম মানুষ গড়ে না, বা এ নিয়ম তাহার নির্দেশে সমাজে আরোপিত হয় নাই।[১৪]

সুতরাং প্রজ্ঞানের দুর্বার গতিকে রুখবার সাধ্য কোন সরকারের নেই। মানুষ যতই বুদ্ধির বলে সমাজের নিয়মগুলো আয়ত্ত করতে পারে ততই সে এই নিয়ম খাটিয়ে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়। বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ প্রভুতন্ত্রকে ছাড়িয়ে নিরাজ মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। সরকারের আসনে বসে প্রজ্ঞান তার আধিপত্য নিয়ে।

> যে কোন সমাজে মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব সেই সমাজের বিচারবুদ্ধির স্তরের বিপরীত অনুপাতে ওঠানামা করে।...ঠিক যেমন ন্যায়ের নিশ্চিত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বলপ্রয়োগ ও প্রতারণার অধিকার পিছাইয়া যায় এবং অবশেষে সমাজসাম্যে বিলীন হয়, তেমনি মানুষের খেয়ালের রাজত্ব প্রজ্ঞানের রাজত্বকে পথ ছাড়িয়া দেয়।...মানুষ যেমন ন্যায়ের সন্ধান করে সাম্যে, সমাজ তেমন শৃঙ্খলা খোঁজে নৈরাজ্যে।[১৩]

সমাজ শিশু অবস্থায় ছিল প্রভুনির্ভর, প্রাপ্ত বয়সে হবে আত্মনির্ভর। সকলের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ হবার পরও কিছু সমাজবিরোধী লোক থাকতে পারে। তাদের শাসন করবে জনমত। অবাধ চুক্তি দ্বারা পরস্পরের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হবে এবং চুক্তিভঙ্গের অপরাধের জন্যে নিয়ম মত শাস্তি পেতে হবে।

> চুক্তিবন্ধ হইয়া তুমি স্বাধীন মানুষের সমাজের সভ্য হও। তোমার কিংবা তাহাদের যে কোনো পক্ষে চুক্তির খেলাপ হইলে সে অপরের কাছে দায়ী হইবে এবং এই দায়ের পরিণাম নির্বাসন ও মৃত্যুও হইতে পারে।[১৬]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই লক্ষ্য—প্রভুসমাজের স্থানে নিরাজ সমাজের অবতারণা। সুন্দর একটি সংবিধান রচনা করে রাজশক্তি ও ব্যক্তি-অধিকারের মধ্যে গণ্ডি টেনে দেওয়া, রাষ্ট্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে রাষ্ট্রকৃত্য ভাগ করে দেওয়া, এ কাজ নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ রাষ্ট্র ও তার সমস্ত উপসর্গকে সমূলে উৎপাটন করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মুক্তির বিজ্ঞান, শাসন-বিজ্ঞান দাসত্বের বিজ্ঞান, তাকে যে নাম দিয়েই ঢাকবার চেষ্টা কর না কেন। "শাসনহীন শৃঙ্খলার মধ্যে সমাজের চরম বিকাশ।"

---

[১৩] কঁফেসিয়ঁ, ৬১ পৃষ্ঠা।
[১৪] ইদে জেনেরাল, ২৮১ পৃষ্ঠা।
[১৫] প্রপ্রিয়েতে? ৫,. ২২।
[১৬] ইদে জেনেরাল, ৩৪৩ পৃষ্ঠা।

গডউইন অরণ্যে রোদন করে গিয়েছিলেন, প্রুদঁ বিফল সংগ্রামে শক্তিপাত করে গেলেন। রাষ্ট্রের বিশাল ইমারত থেকে একটি ইটের টুকরাও তিনি খসাতে পারেন নি। কালধর্ম ছিল তাঁর বিপক্ষে। সে যুগের প্রচণ্ড বিপ্লবী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তিনি তাল রাখতে পারেন নি। শ্রেণীসংগ্রাম, জাতিবিদ্বেষ চমকলাগানো রোমাঞ্চকর ঘাত-প্রতিঘাত, এতে তাঁর কোনো নেশা ছিল না। অথচ সে যুগের আশা ভরসা এসবের ভেতর দিয়েই ফুটে উঠেছে। এদিক দিয়ে প্রুদঁর বাস্তব জ্ঞানের অভাব ছিল। "অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব", যে বইয়ের বিকল্প নাম দিয়েছিলেন তিনি "দারিদ্র্যের দর্শন" তাতে তিনি দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন সমাজের ও উৎপাদনের দ্বান্দ্বিক শক্তিগুলির সামঞ্জস্য করে। এই তত্ত্বকথাটিকে তিনি বাস্তব আকার দিতে পারেন নি, আদর্শের অনুগামী প্রত্যক্ষ কর্ম-পদ্ধতি দিতে পারেন নি। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কার্ল মার্ক্স্ তাঁর পুস্তকের কঠোর সমালোচনা করলেন। প্রুদঁর "দর্শনের দারিদ্র্য" তার অমূল্য তত্ত্ব নিয়ে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গেল, মার্ক্স্-এর "দারিদ্র্যের দর্শন" তার নিষ্ঠুর শ্লেষের ধারে স্মরণীয় হয়ে রইল।

মার্ক্স্-এর মত প্রুদঁ একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন যে ধনিকশ্রেণীর দিন ফুরিয়ে এসেছে। সংখ্যায়, কীর্তিতে, প্রতিভায়, সব দিক দিয়ে এরা ক্ষয়িষ্ণু। এ বিশ্বাস যে কত ভ্রান্ত তা পরবর্তী একশ বছর ধরে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প কী দ্রুতগতিতে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে, এই প্রগতির যারা বাহক তাদের সামনে যে কত সম্ভাবনা, গডউইনের মতো প্রুদঁও ছিলেন এ বিষয়ে অন্ধ। উৎপাদক শ্রেণীর প্রতি দরদে তাঁদের বাস্তব দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সাম্যবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী পাঁজাটিভস্ট্রা ঠিকই বুঝেছিলেন যে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প সমাজকে কেন্দ্রায়িত কর্তৃত্বের আওতায় নিয়ে যাচ্ছে। প্রুদঁর ভরসা ছিল উৎপাদকরা সম্মিলিত হলে বৈজ্ঞানিক প্রণালী আয়ত্ত করতে পারবে। কেমন করে আয়ত্ত করবে, কেমন করে উৎপাদনে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করবে, বলপ্রয়োগ ছাড়া কি উপায়ে মূলধন ও যন্ত্র তাদের হাতে আসবে এ সম্বন্ধে তাঁর কোন কার্যকরী ধারণা ছিল না। শিল্পযুগের উৎপাদনে যে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন তা যোগানো বিনিময় ব্যাঙ্ক বা সমবায় ব্যাঙ্কের সাধ্য ছিল না। প্রুদঁর যুগটা ছিল লড়াইয়ের যুগ, লড়াই না করে কোনো পাওনা আদায় হওয়া ছিল অসম্ভব। প্রুদঁ লড়াইকে এড়িয়ে ভাবনার পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকতে চেয়েছিলেন। সংকটের সময়ে বসে থাকলে তলিয়ে যেতে হয়। মধ্য উনিশ শতকের প্রচণ্ড রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝাপটায় প্রুদঁও তলিয়ে গেছেন।

গডউইন ও প্রুদঁর মূল্যবিচারে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। সমাজ নিষ্পাপ, রাষ্ট্র যত নষ্টের মূল। প্রুদঁ রাষ্ট্র ভেঙে দিয়ে সমাজকে আত্মনির্ভর করতে চেয়েছেন, ঊর্ধ্বতন কাজ চালাবার জন্যে গণভোটে নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা আনতে চেয়েছেন। বণিক সংঘ যেমন গণতান্ত্রিক প্রথায় ব্যবসায়ের স্বার্থ রক্ষা করে এবং নিজেদের মৌথ কাজকর্ম চালিয়ে যায়, তেমন রাষ্ট্রকৃত্যও লোকায়ত্ত হয়ে স্বাধীন সংঘশক্তি দ্বারা পরিচালিত হবে, তাতে সরকারের দুর্নীতি ও নিপীড়ন বন্ধ হবে—এই ছিল তাঁর ধারণা। রাষ্ট্রের এক্তিয়ারের বাইরে এমন স্বশাসিত জনসংঘ সকল দেশে আছে, সর্বত্র জেলায় জেলা-সভার নগরে পৌরসভার শাসন অল্পবিস্তর স্বায়ত্ত। সরকারী বিভাগে যে দুর্নীতি, অপচয় ও অত্যাচার চলে এদের মধ্যে তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এগুলো গণতান্ত্রিক সরকারের ছোট সংস্করণ। যে দেশে যেমন মানুষ সে দেশে তেমন সরকার, তেমন জনসংঘ,

তেমন পৌরসভা। কাঠাম বদলালে মানুষ বদলায় না, প্রশাসনের সংস্কার হয় না। গডউইন ও প্রুদঁ উভয়ের বিশ্বাস ছিল যে বুদ্ধির বিকাশ হলে সব দোষ শুধরে যাবে। আঠার শতক ও আদি উনিশ শতক প্রজ্ঞানের যুগ। বুদ্ধির ওপর আদর্শবাদীর অসীম নির্ভরতা যুগধর্মের গুণে। বুদ্ধি দিয়ে যে চরিত্র তৈরী হয় না, স্বার্থ ও অধিকারের চেতনা জন্মালেই যে সহযোগবৃত্তি জেগে ওঠে না, বুদ্ধিসর্বস্ব দার্শনিকের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। গডউইন ও প্রুদঁ আদর্শ দিয়েছেন, পথ দেখানি, প্রতিমা গড়েছেন তাতে প্রাণসঞ্চার করেননি। তাঁরা বোঝেননি যে মুক্ত শুদ্ধ সমাজগঠনের জন্যে বুদ্ধির অতিরিক্ত আরো কিছু মসলার দরকার।

আদর্শ সমাজবিন্যাস হিসাবে এনার্কি শব্দের প্রয়োগ প্রুদঁর কলমে প্রথম নয়, তাঁর আগে গডউইন এই শব্দ ব্যবহার করে গেছেন। বরং প্রুদঁর এনার্কি একটু ফিকে, গডউইনের মত তিনি আইন ও আইনসভাকে একেবারে খারিজ করতে পারেননি। যে মন-মাতানো বুলির জন্যে প্রুদঁ অমর হয়ে আছেন—"সম্পত্তি চোরাই মাল" তাও তাঁর মৌলিক নয়, তার মর্মার্থ পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পাওয়া।[১৭] তথাপি নিঃসন্দেহে তিনি আধুনিক নৈরাজ্যবাদের জন্মদাতা। গডউইনের দায় বহন করবার মত দার্শনিক ইংল্যান্ড অথবা ইয়োরোপে ছিল না। তিনি তাঁর চিন্তাধারার বিস্তার করবার জন্যে কোনো শিষ্য গড়ে যাননি। প্রুদঁ এমন একজন লোককে দীক্ষিত করে গেলেন যাঁর কথায় এবং কাজে মানুষকে মাতিয়ে তুলবার শক্তি ছিল। ইনি উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বাকুনিন। মুক্ত নিরাজ সমাজ বহুধা বিস্তৃত ছোট ছোট গ্রামসভা ও পৌরসভার সন্নিবেশে গড়ে উঠবে, এই বীজমন্ত্র তিনি গ্রহণ করলেন। প্রুদঁর "বিপ্লবের মূল আদর্শ" থেকে তিনি পাতার পর পাতা তাঁর নিজের প্রচার পুস্তিকাগুলিতে আহরণ করেছেন। প্রুদঁর আদর্শ তিনি নিয়েছেন, তাঁর নির্ধারিত উপায় তিনি নেননি, শান্তিপূর্ণ নিরাময় সংগ্রামে তাঁর কোনো বিশ্বাস ছিল না। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের পাঠও বাকুনিন পেয়েছিলেন প্রুদঁ ও মার্ক্স্ থেকে। বাকুনিনের বন্ধু হারজেন তাঁর আত্মকথায় কার্ল ভগ্ট্-এর একটি গল্প উদ্ধৃত করেছেন। প্রুদঁ ও বাকুনিন হেগেলের ফেনোমেনলজি নিয়ে আলোচনায় বসেছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায় দেখে ভগ্ট্ ক্লান্ত মনে বাড়ি চলে গেলেন। পরদিন সকালে তিনি বাকুনিনের ঘরে এসে দেখেন চিম্নীর পোড়া ছাইগুলোর পাশে বসে দুই বন্ধু তাঁদের আলোচনা শেষ করছেন।

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ প্রসঙ্গে মার্ক্স্ও প্রুদঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন ১৮৪৪ সালে পারীতে। আবার এই দ্বন্দ্ববাদ নিয়েই উভয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হল। মার্ক্স্ বলতেন প্রুদঁ জার্মান জানতেন না তাই হেগেলের তত্ত্ব তিনি হজম করতে পারেননি। প্রুদঁকে তিনি পাতি বুর্জোয়া বলে গালাগালি দিলেন। মার্ক্স্-এর সমালোচনার নমুনা :

> তিনি হইতে চান সমন্বয়, হইয়াছেন বিভ্রান্তির সমাবেশ। তিনি চান বৈজ্ঞানিক হইয়া বুর্জোয়া ও প্রলিতারিয়দের ঊর্ধ্বে উড়িতে, আসলে তিনি ধন ও শ্রম, অর্থনীতি ও সাম্যবাদ উভয়ের মাঝে অবিরাম দোদুল্যমান একটি পাতি বুর্জোয়া ("দর্শনের দারিদ্র্য")।

কিন্তু মার্ক্স্ স্বীকার না করলেও ঐতিহাসিক প্রুদঁর প্রতি তাঁর দেনার হিসাব

[১৭] প্রুদঁর আগে রিসো এবং তাঁর আগে এ ধরনের কথা বলে গেছেন নিউ টেস্টামেণ্টে সেণ্ট্ জেমস্ এবং জর্মানীর চার্যীযুদ্ধের নেতা মুনৎসার। "চতুরঙ্গ", কার্তিক—পৌষ ১৩৬৫ দ্রষ্টব্য।

ভুলবেন না। যে বই নিয়ে তিনি নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ করেছেন সে বইয়ের তত্ত্ব তিনি বেপরোয়াভাবে ধার করেছেন। অবাধ বাণিজ্যের নামে যে শ্রমিক শোষণ চলেছে, নিজের শ্রমমূল্য লাভ করবার অধিকার যে প্রত্যেকের থাকবে, আর শ্রমমূল্য যে হবে ন্যায্য বিনিময়ের হার এসকল হক কথা মার্ক্‌স্‌-এর আগে শুনিয়েছেন প্রুদঁ, যা "ক্যাপিট্যাল"এর পাতায় পাতায় বহু তথ্য সম্ভারে বিস্তারিত।

প্রুদঁ'র মৃত্যুর কিছু আগে পারীর যাটজন শ্রমিক কর্মী প্রজাতন্ত্রী দল থেকে বেরিয়ে এসে একটা ইস্তাহার প্রচার করে। প্রুদঁ দেখলেন যে শ্রমিকশক্তি এতদিন বুর্জোয়া নেতৃত্বের পিছনে পিছনে চলেছে, এবার তাদের চৈতন্য হয়েছে, এবার দেখা দিয়েছে যথার্থ প্রলিতারিয় নেতৃত্ব। তাঁর শেষ গ্রন্থ "শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি" এদের লক্ষ্য করে লেখা। পারীর শ্রমিকদের সিদ্ধান্তকে তিনি 'উনিশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা' বলে স্বাগত জানালেন।

> শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিদগ্ধ মনের অভাব নাই, এবং যথেষ্ট পরিমাণে আছে যাহারা নেতৃত্ব লইতে পারে...যে সব উকিল, সাংবাদিক, লেখক, চক্রান্তকারী ও সুবিধাবাদী এতদিন ইহাদের ভোট লইয়া আসিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা ইহারা বিশগুণ যোগ্য এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত।[১৮]

শ্রমিক আন্দোলনের ওপর প্রুদঁ'র প্রভাব এই বই থেকে বর্তায়েছে। শ্রমিক আন্তর্জাতিকের অধিবেশনে ফরাসী শ্রমিক প্রতিনিধিরা সরকারী হস্তক্ষেপ ও প্রলিতারিয় একনায়কত্বের বিরোধিতা করল, বিনা সুদে ধার ও সমশ্রমমূল্যের হারে বিনিময় প্রথার দাবি পেশ করল। বাকুনিনের বহিষ্কারের পর আন্তর্জাতিক থেকে প্রুদঁ'র ভাবধারাও অপসৃত হল। শতাব্দীর শেষে যখন ফার্নাদঁ পেলুতিয়ে ও জর্জ সরেল শ্রমিকদের নিয়ে সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর মতবাদ খাড়া করলেন এবং সমাজবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন তখন শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়াদের প্রভাব থেকে মুক্ত করবার কাজে তাঁরা প্রুদঁ'র যুক্তিরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

[১৮] কাপাসিতে পলিতিক, ৮৭ পৃষ্ঠা।

অচেনা

আলবেয়ার কাম্যু

মোটামুটি বলতে গেলে মাসগুলো যে একেবারে কাটতে চায়নি এমন নয়। প্রথমবারের গ্রীষ্ম গেছে কিনা গেছে টের পেতে না পেতেই আবার গরম পড়ে গেল। আমি বুঝেছিলাম যে সত্যিকার গ্রীষ্মের দিন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা আমার কপালে ঘটবে। আমার মামলা একেবারে আদালত বন্ধের দিকে হবে শুনেছিলাম। জুন মাসেই আদালত বন্ধ হয়।

বিচার যেদিন শুরু হল সেদিনটা রোদে ঝলমল করছে। আমার উকিলের কাছে আশ্বাস পেলাম যে দু তিন দিনের বেশি বিচারে লাগবে না।—যা শুনেছি, উকিল আমায় জানালেন, তাতে আপনার মামলা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদালত চুকিয়ে দেবে কারণ এর চেয়ে শক্ত বড় মামলা আছে। আপনার পরই একটা পিতৃহত্যার কেস উঠবে। সময় নেবে সেইটেই।

সকাল সাড়ে সাতটায় আমায় নিতে এল। কয়েদীদের ঢাকা গাড়িতে আমায় আদালতে নিয়ে যাওয়া হল। আমার সঙ্গের দুজন পুলিশ তারা ছোট্ট একটা কুঠুরিতে আমায় নিয়ে গিয়ে তুললে। সেখানে অন্ধকারেরই যেমন কেমন একটা গন্ধ। একটা দরজার কাছে আমরা বসলাম। দরজার ওধার থেকে কথাবার্তা চেঁচামেঁচি চেয়ার টানাটানির শব্দ মিলে এমন একটা গোলমাল আসছিল যাতে মফস্বল শহরের 'সামাজিক সম্মেলন' গোছের ব্যাপার মনে পড়ে যায়। কনসার্ট শেষ হয়ে গেলে নাচের জন্যে হল খালি করতে গিয়ে যে রকম সোরগোল শুরু হয়ে যায় কতকটা সেই রকম।

জেলেরা এখনো আসে নি জানিয়ে একজন পুলিশ আমায় একটা সিগারেট দিতে চাইলে। দরকার নেই বললাম। খানিকবাদে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে আমি ঘাবড়ে গেছি কিনা। বললাম,—না। মামলার বিচার দেখার বরং একটু আগ্রহই আছে জানালাম কারণ আগে কখনও এ সুযোগ আমার হয় নি।

—তা হতে পারে। অন্য পুলিশটি বললে, তবে ঘণ্টা দুয়েকের পরই দিক ধরে যায়।

কিছুক্ষণ বাদে কামরায় একটা বিজলী ঘণ্টা আস্তে বেজে উঠল। আমার হাতকড়া খুলে পুলিশ দুজন আমায় আসামীর কাঠগড়ায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালে।

আদালত-ঘরে বেশ ভিড়। বড় বড় জানলার খড়খড়িগুলো নামানো। তবু তার ফাঁক দিয়ে বেশ আলো আসছে। হাওয়া এর মধ্যেই বেশ গরম। জানলাগুলো আগে থেকেই বন্ধ করা ছিল। আমি বসবার পর পুলিশ দুজন আমার চেয়ারের দুধারে দাঁড়াল।

এইবার আমার ওধারের এক সারি মুখ আমার নজরে পড়ল। তারা কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম তারাই জুরী। কেন বলা যায় না, তাদের আলাদা আলাদা মানুষ হিসাবে আমি যেন ভাবতেই পারি নি। রাস্তায় মাঝপথে ট্রামে উঠলে অন্য দিকের সীটে বসা সব যাত্রী মজার কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখবার জন্যে যখন এক দৃষ্টে তাকায় তখন যে রকম লাগে আমার অনেকটা সেই রকম লাগছিল। অবশ্য তুলনাটা ঠিক নয়। আমার মধ্যে এরা মজার কিছু নিশ্চয় খুঁজছিল না, খুঁজছিল অপরাধের ছাপ কি

আমার মধ্যে পাওয়া যায় তাই। যাই হোক দুই-এ তফাতটা এমন কিছু নয়। আর আমার অন্তত ওই রকমই মনে হয়েছিল।

একে ভিড় তারপর আদালতের বন্ধ গুমোট। আমার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। চারদিকে তাকিয়ে একটা চেনা মুখও দেখতে পেলাম না। প্রথমে তো বিশ্বাস করতেই পারছিলাম না যে এত লোক শুধু আমার জন্যেই এসেছে। এত লোকের লক্ষ্য বস্তু হওয়া একটা নতুন অভিজ্ঞতা। সাধারণত আমায় বড় কেউ নজর করে দেখে না।

—কি গাদাগাদি লোক! আমার বাঁ দিকের পুলিশকে বললাম।

সে বোঝালে যে খবরের কাগজগুলোর জন্যেই এত ভিড় হয়েছে।

জুরীদের আসনের নিচেই একটা টেবিলে কয়েকজন বসে আছে। তাদের দেখিয়ে দিয়ে সে বললে,—ওই তো ওরা!

—কারা? জিজ্ঞাসা করলাম।

—খবরের কাগজের লোক! সে বললে, ওদের একজন আবার আমার পুরানো বন্ধু।

একটু বাদেই খবরের কাগজের সেই লোকটি আমাদের দিকে চেয়ে কাঠগড়ার কাছে এসে পুলিশ বন্ধুর সঙ্গে সোৎসাহে করমর্দন করলেন। লোকটির বয়স হয়েছে, মুখটা কড়া রকমের গম্ভীর। কিন্তু ব্যবহার বেশ ভালো। এই সময়েই চোখে পড়ল যে আদালতের প্রায় সব লোকই এ ওকে প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেছে। যেন এটা কোন জমায়েৎ হবার আড্ডা, নিজের মনের ও রুচির মানুষ পেয়ে যেখানে সহজ হওয়া যায়।

সেই জন্যেই নিজেকে কেমন অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছিল—যেন অনাহূত এসে পড়েছি।

খবরের কাগজের লোকটি অমায়িকভাবেই আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। বললেন, —আশা করি হ্যাঙ্গামাটা ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে উঠবেন।

ধন্যবাদ জানাতে তিনি একটু হেসে বললেন,—জানেন আপনাকে নিয়ে কাগজে একটু লেখালেখি করছি। এই গ্রীষ্মের সময় লেখবার মত রঙদার তেমন কিছু বড় থাকে না। আপনার আর আপনার পরে যে মামলা উঠবে তা ছাড়া জোরালো খবর এতদিন কিছু জোটেনি বললেই হয়। পরের মামলাটার কথা শুনেছেন বোধ হয়—বাপকে খুন করার দায়ে ছেলের বিচার।

সাংবাদিকদের টেবিলে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা পরা ছোট্টখাট্ট নাদুসনুদুস একজনকে দেখিয়ে তিনি বললেন,—উনি প্যারিসের একটি দৈনিক কাগজের বিশেষ সংবাদদাতা। পিতৃহত্যার মামলাটার বিবরণ দেবার জন্যেই ওঁকে পাঠান হয়েছে। তবে আপনার মামলাটা সম্বন্ধেও উনি লিখবেন।

লোকটিকে দেখে আমার মনে হল যেন হৃষ্টপুষ্ট একটি ভাম।

ওঁদের খুব অনুগ্রহ বলতে হবে। বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু কথাটা নেহাৎ হাস্যকর শোনাবে বুঝলাম।

লোকটি প্রসন্নভাবে হাত নেড়ে বিদায় নিলেন। কিছুক্ষণ তারপর আর কিছুই হল না।

এর পরই আর কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে আমার উকিল ব্যস্ত সমস্ত হয়ে আদালতে ঢুকলেন। গায়ে তাঁর উকিলের গাউন। তিনি প্রথমেই সাংবাদিকদের টেবিলে গিয়ে সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন। খানিকক্ষণ তারা গল্পগুজব হাসি ঠাট্টায় কাটাবার পর

একটা ঘণ্টার চড়া আওয়াজ শোনা যেতেই যে যার জায়গায় গিয়ে বসল।

আমার উকিল আমার কাছে এসে করমর্দন করে আমায় সব প্রশ্নের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত জবাব দেবার পরামর্শ দিলেন। আমি যেন নিজে থেকে কোন খবর না বলি আর তাঁর ওপর ভরসা রাখি, এই তাঁর বলবার কথা।

আমার বাঁদিকে একটা চেয়ার টানার কর্কশ আওয়াজ হল। প্যাসনে-পরা রোগা লম্বা একটি লোক তাঁর লাল গাউন গুটিয়ে নিয়ে বসলেন। ইনিই সরকার পক্ষের উকিল বুঝলাম। আদালতের পেয়াদা হাঁক দিয়ে জানাল যে মহামান্য বিচারকেরা আসছেন। বিচারকেরা আদালতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর দুটো বড় বড় বিজলী পাখা ভন ভন করে ঘুরতে শুরু করল। আদালতের মেঝে থেকে কয়েক হাত উঁচু বেদীর ওপর পাতা আসনে বিচারকেরা বেশ দ্রুতপদে এসে বসলেন। বিচারক সবসুদ্ধ তিনজন। দুজনের পোশাক কালো একজনের লাল। তাঁদের প্রত্যেকের বগলে একটা করে ব্রীফ কেস। মাঝখানের সব চেয়ে বড় পিঠওয়ালা চেয়ারটায় যাঁর গায়ে লাল পোশাক তিনিই বসলেন। তাঁর দুধারে বাকি দুজন। মাথা থেকে বিচারকের টুপিটা নামিয়ে টেবিলের ওপর রেখে একটা রুমাল টাকের ওপর বুলিয়ে প্রধান বিচারপতি ঘোষণা করলেন যে মামলার শুনানি এবার শুরু হবে।

সাংবাদিকেরা তখন কলম বাগিয়ে তৈরী। একজন ছাড়া তাদের সবারই মুখে একটা বিদ্রুপের তাচ্ছিল্য ফুটে উঠেছে। সে লোকটির বয়স অন্যদের তুলনায় কম। পরণে ছাই রঙের ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার। গলায় নীল রঙের টাই। কলমটা টেবিলের ওপর রেখে সে তীক্ষ্ণ কঠিন দৃষ্টিতে আমাকে দেখছিল। সাদাসিধে থ্যাবড়া মুখ, কিন্তু চোখগুলোর বিশেষত্ব আছে। খুব ফিকে নীল উজ্জ্বল চোখ। আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেও তার মুখে স্পষ্ট কোন ভাব আছে কিনা বোঝা গেল না।

মুহূর্তের জন্যে আমার অদ্ভুতভাবে মনে হল আমি যেন নিজেই নিজেকে তন্নতন্ন করে দেখছি। সেই জন্যে আর হয়ত কোর্টের কাজের দস্তুর আমার জানা না থাকায় প্রথমটা কি হল আমি ভালো করে খেয়াল করতে পারি নি। জুরীদের জন্যে লটারি করা, প্রধান বিচারপতির সরকারী উকিল জুরীদের নেতা ও আমার উকিলকে নানা প্রশ্ন (বিচারপতির প্রতিটি কথায় জুরীদের মাথাগুলো এক সঙ্গে তাঁর দিকে ঘুরে যাচ্ছিল) আমার বিরুদ্ধে নালিশটা পড়া, আমার উকিলকে উপরি কয়েকটা প্রশ্ন করা সব যেন কেমন গোলমালের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি পড়বার সময় কয়েকটা পরিচিত জায়গা আর লোকের নাম শুধু আমি চিনতে পারলাম।

বিচারক এবার সাক্ষীদের তালিকা জানান হবে বললেন। তালিকায় কয়েকটি নাম শুনে আমি বেশ অবাকই হলাম। আদালতের যে ভীড় এতক্ষণ আমার কাছে অস্পষ্ট কটা মুখ ছিল মাত্র তার ভেতর থেকে একে একে রেমন্ড ম্যাসন সালামানো, আতুরাশ্রমের সেই দরোয়ান, বুড়ো পেরেজ আর মারী উঠে দাঁড়িয়ে পর পর পাশের একটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। মারী শুধু যাবার আগে আমার দিকে কেমন সংকুচিতভাবে একবার হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানালে।

এদের কাউকে আগে লক্ষ্য করিনি ভেবে আমার আশ্চর্য লাগছিল। শেষ নামটা এবার শুনলাম। সেলেস্তিও সাক্ষীদের মধ্যে আছে তাহলে। সে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তার পাশের মহিলাটির দিকে নজর গেল। পুরুষালী কোট পরা চটপটে আত্মম্ভরি যে অদ্ভুত

মহিলা রেস্তোরাঁয় আমার টেবিলে বসে খেয়েছিলেন তিনি এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর এখানে আসায় অবাক হবার সময়ই পেলাম না। প্রধান বিচারক তাঁর কথা তখন শুরু করেছেন।

আসল বিচার এবার শুরু হবে জানিয়ে তিনি বললেন যে আদালতে বিচার যাঁরা শুনতে এসেছেন তাঁরা যেন শান্ত শিষ্ট হয়ে থাকেন একথা জানানই বাহুল্য। তিনি এখানে এক রকম মধ্যস্থ হয়ে বিচার যাতে সুপরিচালিত হয় তারই তদারক করতে উপস্থিত। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষই তিনি থাকবেন। জুরীদের রায় তিনি ন্যায়ের দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করবেন। সব শেষে তিনি আবার জানালেন কোথাও একটু আধটু গোলমাল হলেই আদালত থেকে বাইরের সবাইকে তিনি বার করে দেবেন।

বেলা বাড়ার সঙ্গে গরমও বাড়ছে। সাধারণ দর্শকদের অনেকে খবরের কাগজ নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে। আদালতে সারাক্ষণ কাগজের খসখস শব্দ। প্রধান বিচারক ইশারা করায় একজন চাপরাশী খড়ের বোনা তিনটে হাত-পাখা এনে দিলে। বিচারকেরা তার সদ্ব্যবহার শুরু করলেন।

আমার জবানবন্দী এইবার শুরু হল। বিচারপতি খুব শান্তভাবে এবং আমার যেন মনে হল একটু অন্তরঙ্গ হয়েই আমায় প্রশ্ন করতে লাগলেন। এই নিয়ে কতবার যে জানি না আমায় নিজের বিস্তারিত পরিচয় দিতে হল। একঘেয়ে ব্যাপারটায় একেবারে বিরক্তি ধরে গেলেও বুঝলাম এরকমটা না হয়ে উপায় নেই। আদালত যদি ভুল লোককে বিচার করতে বসে তাহলে তো সর্বনাশ।

বিচারক এবার আমি যা যা করেছি তার বিবরণ দেওয়া শুরু করলেন। একটু বাদে বাদেই থেমে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন,—কি ঠিক তো? আমি তাতে সায় দিয়ে বলি, —আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার উকিল আমায় এই পরামর্শই দিয়েছে।

ব্যাপারটা অনেকক্ষণ চলল। কারণ বিচারক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকটি বিষয় বলতে লাগলেন। সাংবাদিকদের কলম তখন সবেগে চলছে। মাঝে মাঝে শুধু চেঁর পাচ্ছিলাম কমবয়সী সেই লোকটি আর সেই অদ্ভুত কলের পুতুলের মত মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। জুরীদের সকলের নজর লাল পোশাক পরা প্রধান বিচারকের দিকে। আবার আমার সেই ট্রামের যাত্রীর সারির কথা মনে পড়ে গেল।

এইবার একটু কেশে নিয়ে, নিজের কাগজ পত্রের ফাইলটার কটা পাতা উলটে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে বিচারক গম্ভীরভাবে আমায় কয়েকটি কথা বললেন।

তিনি জানালেন যে ভাসাভাসা ভাবে দেখলে অবান্তর মনে হতে পারে এমন কয়েকটি প্রসঙ্গ এবার তিনি তুলতে চান কারণ তাঁর মতে আসলে সেগুলি অত্যন্ত দরকারী।

বুঝলাম তিনি মা-র কথা এবার বলবেন। কি বিশ্রীই যে এসব কথা লাগবে তাও বুঝতে পারলাম।

প্রথমেই তিনি জানতে চাইলেন, মাকে আমি আতুরাশ্রমে পাঠিয়েছিলাম কেন।

বললাম যে কারণটা বোঝা খুবই সহজ। তাঁকে বাড়িতে রেখে ঠিকমত যত্ন নেবার মত সঙ্গতি আমার ছিল না।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মার সঙ্গে ছাড়াছাড়িতে আমার কষ্ট হয়েছে কিনা।

বুঝিয়ে বললাম যে মা বা আমি দুজনেই পরস্পরের কাছে আর পরস্পরের কাছে কেন কারুর কাছেই বিশেষ কিছু আশা করতাম না। তাই অতি সহজেই নতুন অবস্থার সঙ্গে

আমরা মানিয়ে নিয়েছি।

এ প্রসঙ্গ আর তাঁর বাড়াবার ইচ্ছে নেই জানিয়ে বিচারক সরকারী উকিলকে তাঁর কিছু জিজ্ঞাসা করবার কথা মাথায় এসেছে কিনা জানতে চাইলেন।

সরকারী উকিল আমার দিকে সম্পূর্ণ না ফিরে ও আমার দিকে না চেয়েই বললেন যে বিচারপতির অনুমতি নিয়ে তিনি জানতে চান যে আমি খাঁড়িটার কাছে যখন ফিরে যাই তখন সেই আরবকে মারবার মতলব নিয়েই গিয়েছিলাম কিনা।

উত্তরে আমি বললাম যে, না সেরকম মতলব আমার ছিল না।

তাহলে রিভলভারটা নিয়ে গেছলাম কেন, আর কেনই বা ঠিক সেই জায়গাটাতেই গেছলাম?

বললাম, নেহাৎ দৈবাৎ।

সরকারী উকিল মুখ বাঁকিয়ে বিশ্রীভাবে বললেন,—আচ্ছা, আপাতত এ পর্যন্তই থাক।

তারপর কি কি হল আমি ঠিক সব বুঝতে পারলাম না।

যাই হোক সরকারী উকিল বিচারপতিরা ও আমার উকিল খানিকক্ষণ কি পরামর্শ করবার পর প্রধান বিচারপতি জানালেন যে এখন বিরতি হয়ে আবার বিকালে বিচার আরম্ভ হবে। সাক্ষীদের তখন ডাক পড়বে।

কি হল বুঝতে না বুঝতেই দেখলাম আমায় তাড়াহুড়ো করে জেলখানার গাড়িতে তোলা হয়েছে। জেলখানায় নিয়ে গিয়ে আমায় দুপুরের খাবার দেওয়া হল। তারপর কি ক্লান্ত যে হয়েছি, তা বোঝবার সময়টুকুই যেন শুধু দিয়ে আমায় আবার সেই আদালত ঘরে নিয়ে গিয়ে ওরা তুললে। সেই সব মুখের জটলার মাঝে আবার সেই বিচার শুরু হল।

ইতিমধ্যে কিন্তু গরম অত্যন্ত বেড়েছে। কোন ভোজবাজিতে যেন সকলের হাতেই এখন একটা করে পাখা। জুরী, আমার উকিল, সরকারী উকিলের হাতে তো বটেই, সাংবাদিকদের হাতে পাখা চলছে। সেই কমবয়সী সাংবাদিক আর সেই কলের পুতুল মহিলাটি তাঁদের জায়গায় ঠিক বসে আছেন। তবে তাঁরা পাখা চালাচ্ছেন না। আগের মতই একদৃষ্টে আমায় লক্ষ্য করছেন।

মুখের ঘামটা মুছলাম। কোথায় যে আছি বা কেন সব যেন কেমন গুলিয়ে গেছে। সাক্ষী হিসেবে আতুরাশ্রমের পরিচালকের নাম ডাকতে একটু হুঁস হল।

আমার মা আমার ব্যবহার নিয়ে ক্ষোভ জানাতেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে হ্যাঁ তা জানাতেন। সেই সঙ্গে অবশ্য বললেন যে সে ক্ষোভটা এমন কিছু ধর্তব্য নয়, কারণ আতুরাশ্রমের প্রায় সবারই আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে ওরকম নালিশ আছে।

বিচারপতি ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করে বোঝাতে বললেন, জিজ্ঞাসা করলেন যে আতুরাশ্রমে পাঠিয়েছি বলে আমার মা-র আমার বিরুদ্ধে নালিশ ছিল কিনা।

পরিচালক বললেন,—ছিল। এবারে ওইটুকুর বেশী আর কিছু তিনি বললেন না।

আরেকটি প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন যে মা-র শেষকৃত্যের দিন আমার কোনরকম অস্থিরতার অভাব দেখে তিনি একটু অবাক হয়েছিলেন। অস্থিরতার অভাব বলতে কি বোঝাতে চান জিজ্ঞাসা করায় তিনি মাথা নিচু করে একবার তাঁর জুতোর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন যে আমি মার মৃতদেহ প্রথমে দেখতে চাইনি, এক ফোঁটা চোখের জলও সেদিন ফেলিনি, আর শেষকৃত্য হয়ে যাবার পরই কবরের কাছে একটু না থেকেই তৎক্ষণাৎ চলে এসেছি। আর একটি ব্যাপারেও তিনি বিস্মিত হয়েছেন। আমার মাকে যারা কবর দিয়েছে

তাদের একজনের কাছে তিনি শুনেছেন যে আমি নাকি মা-র কত বয়স হয়েছিল তাও বলতে পারিনি।

সবাই তারপর কিছুক্ষণ চুপ।

বিচারক এবার জিজ্ঞাসা করলেন যে কাঠগড়ার আসামীর কথাই তিনি বলছেন কিনা।

আতুরাশ্রমের পরিচালক প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে যেন ধাঁধায় পড়েছেন মনে হল।

বিচারক বুঝিয়ে বললেন,—প্রশ্নটা আদালতের দস্তুর বলে আমি করতে বাধ্য।

সরকারী উকিলের কোন কিছু জেরা করবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হল।

তিনি বড় গলায় চেঁচিয়ে বললেন,—না কিছু নেই। যা চাই সবই আমি পেয়েছি।

তাঁর গলার স্বর আর তাঁর মুখের জয়োল্লাসের ভাবটা এমন যে আমার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলবার সময় আহাম্মকের মত আমার চোখ ফেটে জল বেরুতে চাইল। এই প্রথম আমি বুঝলাম যে এখানকার সবাইকার কাছে আমি কি ঘৃণার পাত্র।

জুরীদের আর আমার উকিলকে তাদের কিছু জেরা করবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে বিচারক এবার আতুরাশ্রমের দরোয়ানের সাক্ষ্য নিলেন।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে আমার দিকে একবার তাকিয়েই সে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

জেরায় সে বললে যে আমি মা-র মৃতদেহ দেখতে চাইনি। সিগারেট খেয়েছি ঘুমিয়েছি আর সরেস কফি খেয়েছি। তখনই টের পেলাম একটা ঘৃণার ঢেউ যেন আদালতের ভেতর দিয়ে বয়ে গেল। এইবার প্রথম বুঝলাম যে আমি অপরাধী।

দরোয়ানকে দিয়ে আমার সিগারেট আর কফি খাওয়ার কথাটা আবার বলান হল।

সরকারী উকিল আমার দিকে ফিরলেন। তাঁর চোখে শিকারকে বাগে পেয়ে জব্দ করতে পারার একটা কুৎসিত পরিতোষের দৃষ্টি।

আমার উকিল দরোয়ান নিজে সিগারেট খেয়েছিল কিনা প্রশ্ন করলেন, কিন্তু সরকারী উকিল তাতে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়ে উষ্ণস্বরে বললেন,—আমি জানতে চাই এ মামলায় আসামী কে? কিংবা আমার বিজ্ঞ বন্ধু কি মনে করেন যে বাদী পক্ষের সাক্ষীর ওপর কাদা ছিটিয়ে আসামীর বিরুদ্ধে আসল প্রমাণ যা প্রচুর ও প্রাসঙ্গিক সব উড়িয়ে দিতে পারবেন!

বিচারক এ প্রতিবাদ সত্ত্বেও দরোয়ানকে জবাব দিতে বললেন।

দরোয়ান একটু উসখুস করে তারপর আমতা আমতা করে নিচু গলায় বললে,—কি বলে, আমার অবশ্য উচিত ছিল না জানতাম, তবে উনি সিগারেট দিলে একটা আমি খেয়েছিলাম—ভদ্রতার খাতিরেই।

আমার কিছু বক্তব্য আছে কিনা বিচারপতি জিজ্ঞাসা করলেন।

বললাম,—না। শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে সাক্ষী যা বলেছে তা ঠিক। আমিই ওকে সিগারেট খেতে দিই।

দরোয়ান আমার দিকে অবাক হয়ে একটু সকৃতজ্ঞভাবেই চাইল। তারপর কিছুক্ষণ ইতস্তত করে নিজে থেকেই জানালে যে সে-ই কফি খাওয়ার প্রস্তাবটা করেছিল।

আমার উকিল একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বললেন,—দরোয়ান যে কথা স্বীকার করেছে তার মূল্য যেন জুরীরা বোঝেন।

অনুবাদ : **প্রেমেন্দ্র মিত্র**

[ক্রমশঃ]

আধুনিক সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দী বঙ্গ-মনীষার দীপ্ত বিকাশের কাল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ মনস্বীজনের চিন্তায় ধ্যাননে কর্মে কৃতিত্বে উজ্জ্বল এই শতাব্দী। ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে কোন এক সময়ে এক সঙ্গে এত মনীষী কখনো আবির্ভূত হননি, ভারতের অন্য কোথাও চিন্তাজগতে এত তীব্র আলোড়ন কখনো অনুভূত হয়নি। উনিশ শতকের বাংলা তাই ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধিৎসু মননের লক্ষ্যভূমিরূপে চিহ্নিত।

সুতরাং বিগত শতাব্দী নিয়ে বেশ কিছু লেখা এবং গ্রন্থ আশা করা যেতে পারে। এবং বস্তুত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের কাছ থেকে আমরা সে সম্বন্ধে রচনা পেয়েওছি। কিন্তু সেই সঙ্গেই রূঢ় শোনালেও বলা দরকার যে, উনিশ শতকের বাংলা নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন বা করছেন, তাঁদের অনেকেরই গ্রন্থনির্মাণের চাইতে গ্রন্থনির্মাণের উপকরণ-সংগ্রহেই মনোযোগ বেশি, পরিশ্রমলব্ধ তথ্যসমূহকে চিন্তার সাহায্যে সুবিন্যস্ত করে শেষ পর্যন্ত একটি তৃপ্তিকর ইতিবৃত্ত রচনা করে উঠতে পারেননি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐতিহাসিক নিরাসক্তির অভাব-ই এর একমাত্র কারণ বলা যেতে পারে। উনিশ শতকের বাংলাদেশে এক আশ্চর্য নবজাগরণ ঘটেছিল এবংবিধ পূর্ব-স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত বা ধারণা নিয়ে এই শতাব্দী সম্পর্কীয় লেখকদের অনেকেই উচ্ছ্বসিত লেখনী চালনা করেন। ফলত তাঁদের রচনায় পরিশ্রমী গবেষক কিংবা আবেগ-প্রবণ বাঙালী-মনের পরিচয় মেলে সত্যি, কিন্তু একটি ঐতিহাসিক মননের সাক্ষাৎ দুর্লভ হয়ে দাঁড়ায়। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থে এর ব্যতিক্রম আশা করেছিলাম, কিন্তু সে-প্রত্যাশা অপূর্ণ রয়ে গেল।

২

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা-গ্রন্থ ১৮০০ থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত এবং তা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ, ভূমিকা : পূর্বকথা; এই অংশে লেখক প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগ, ১৮০০—১৮১৩ খ্রীস্টাব্দ, মোট চৌদ্দ বছরের বাংলা সাহিত্যের আলোচনা নিয়ে গড়ে উঠেছে; মূল আলোচ্য বিষয়ের 'প্রথম পর্ব' নামে অভিহিত এই অংশে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে পলাশী যুদ্ধোত্তর বাঙালাদেশ বাঙালীর সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় ভাগ, অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বের বিস্তার-কাল ১৮১৩ থেকে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ; লেখকের ভাষায়, এই সময়কার 'বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে রামমোহন-পর্ব নামে চিহ্নিত করিতে পারি'। 'ভাবস্বপ্ন' নামে চিহ্নিত চতুর্থ ভাগ বা তৃতীয় পর্ব ১৮৩৩ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত বিস্তৃত; বাঙালী জীবনের ও বাঙালী মননের নানা দিক নিয়ে এই আলোচনা-পর্ব রচিত। সর্বশেষ পর্বে কালবিস্তারও ১৮৫৭ পর্যন্ত এবং এই সময়ের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ড প্রসার লাভ করেছিল বলে লেখক বিদ্যাসাগর

ও তাঁর সময়কার বঙ্গ-সংস্কৃতির মোটামুটি একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং সমকালীন নাট্যসাহিত্য সম্পর্কিত নাতিদীর্ঘ আলোচনা এই পর্বের অন্যতম সম্পদ।

৩

আলোচ্য কালপর্ব (১৮০০—১৮৫৭) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নয়। আমাদের সাহিত্যরথীরা তখনো পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন এই পর্বের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে (১৮২০), মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন আরও কয়েক বছর পরে (১৮২৪), বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে, অন্যান্যদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র ও হেমচন্দ্রের জন্মও ঐ সালে, বিহারীলালের বছর দুই আগে অর্থাৎ ১৮৩৬ সালে, নবীনচন্দ্রের ১৮৫২ সালে। সুতরাং এই কালপর্বে উপরি-উল্লিখিত সাহিত্যিকদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের ও তাঁর সমসাময়িক অক্ষয়কুমারের কিছু বইপত্র বেরোয়। কিন্তু এই সময়ে প্রকৃত সাহিত্যগুরুর আসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে যিনি অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে বিরাজ করছিলেন, তিনি হলেন ঈশ্বর গুপ্ত এবং সাহিত্যিক হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ত যে খুবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব নন, এ তত্ত্ব আজ সর্বজন-স্বীকৃত। বস্তুত, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে যা কিছু স্মরণীয় রচনা প্রকাশিত হয়েছে, তা উক্ত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, বিহারীলাল, নবীনচন্দ্র—উনিশ শতকের লক্ষকীর্তি সাহিত্যিকদের রচনাবলীর প্রকাশ আলোচ্য কালপর্বের পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে। আরও লক্ষণীয়, উনিশ শতকরে প্রথমার্ধের সাহিত্যগুরু, একটু অন্যভাবে সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান, ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুও হয় এই সময়, ১৮৫৮ সালে, যাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যে 'death-knell of the old' যেন স্পষ্টভাবে শ্রুত হলো। সুতরাং '১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেটুকু সাহিত্য বিকশিত হইয়াছে, হয়তো তাহার অতি সামান্য অংশই সাহিত্যের পংক্তি-ভোজে আহূত হইতে পারিবে।' তবে যেহেতু শিল্প সাহিত্য স্বসমমুখ কোন জিনিস নয়, দেশের মাটি ও জীবনের গভীরে তা প্রবিষ্টমূল, সুতরাং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্য-সমৃদ্ধির কারণ তার প্রথমার্ধের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও মানস-জীবনে অনুসন্ধেয়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই ঠিকই বলেছেন : '১৮৫৭ সালের পর প্যারীচাঁদ, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে ১৯শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ নব যুগান্তরের সম্মুখীন হইল। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাহারই প্রস্তুতি চলিয়াছে।...১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য যে প্রথমার্ধের সাহিত্যে সুপ্ত ছিল, এবং তাহাই পরার্ধে অনুকূল আবহাওয়ার প্রভাবে অযুত শাখাবিস্তারী অক্ষয়বটের মহিমা লাভ করিয়াছে—উহা আলোচ্য পর্বের সাহিত্য বিচার করিলেই উপলব্ধি করা যাইবে।' (পৃ. ৪৭৮)

সম্ভবত এই কারণেই ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমালোচ্য গ্রন্থে ঐতিহাসিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। সাহিত্য-সমালোচনার চাইতে সাহিত্য-ইতিহাস রচনাই তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এবং আরও ব্যাপকভাবে বলা যায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সাহিত্য বিশ্লেষণে তৎকালীন রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পর্যালোচনা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। লেখকের নিজের জবানিতেই : 'এই আলোচনায় সাহিত্যের রূপ ও রীতি অপেক্ষা ইহার পশ্চাদপটের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে।' (নিবেদন,

পৃ. ৷৶০) সুতরাং 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য' নামীয় গবেষণা-গ্রন্থে যদি কেউ তৎকালিক সাহিত্যের স্বরূপ খুঁজতে চেষ্টা করেন, তবে তিনি হতাশ হবেন।

৪

কিন্তু এই পশ্চাদপট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক ইতিহাস-সচেতনতার পরিচয় দেননি। প্রথমত, পূর্বেই বলেছি, লেখক আর-দশজনের মতো স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরে নিয়েছেন উনিশ শতকে বাংলাদেশে নবজাগরণ হয়েছিল। নবজাগরণ হয়নি এ কথা বলছি না, কিন্তু উনিশ শতকের উপর বই লিখতে গেলে এ সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার অবতারণা কর্তব্য নয় কী? অর্থাৎ বাংলার নবজাগরণের সূচনা মোটামুটি কোন সময় থেকে চিহ্নিত করা যায়, নবজাগরণের চরিত্র ও প্রকৃতি কি ছিল, কাদের জন্য নবজাগরণ (প্রসঙ্গত বলা যায়, বাংলার যে নবজাগরণে বাঙালি মুসলমান সমাজ বহির্ভূত থাকে তা কতখানি পূর্ণতা-সার্থক?) ইত্যাদি মৌল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত ছিল। বস্তুত বাংলার সাহিত্যে সংস্কৃতিতে নবজাগরণের সত্যিকার চেহারা পাওয়া যায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (লেখকেরও এই মত), সুতরাং উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সঙ্গে তার যোগ কোথায়, কেমন করে এবং কতখানি, তা নিয়ে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ধারাবাহিক বা শৃংখলাবদ্ধ আলোচনা আশা করেছিলাম। সামগ্রিকভাবে পলাশি-যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজ ও জীবনাদর্শ এবং অর্থনৈতিক পশ্চাদপট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার পর তাঁর সাহিত্য ও সাহিত্যধৃত বাঙালি মানসজীবনের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। এবং তাহলেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের চেহারা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ত। ইতস্ততভাবে লেখক তৎকালীন রাষ্ট্রিক সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে মন্তব্যাদি যে করেননি তা নয়, কিন্তু কার্য-কারণ বা যুক্তি-ন্যায়ের সূত্রে তাৎকালিক মানস-জীবনের সঙ্গে তাদের গ্রথিত করতে পারেননি বলে প্রভূত পরিশ্রম সত্ত্বেও তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধ সম্পর্কিত আলোচনা চিন্তাকর্ষক হয়ে ওঠেনি।

ফলত লেখক সহজেই বলেন, বাংলাদেশে নবজাগরণ 'রামমোহনের প্রবর্তনায়' ঘটে (পৃ. ৯৬)। ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্তনায় ক্লাব বা সভা-সমিতি সম্ভব, কিন্তু নবজাগরণের মতো ব্যাপক-গভীর আন্দোলন কি সম্ভব হয়? কোন আন্দোলনে ব্যক্তিবিশেষের দান অনস্বীকার্য, কিন্তু তিনি যত বড় ব্যক্তিত্বই হোন না কেন, ক্ষেত্র প্রস্তুত বা আবহাওয়া অনুকূল না হলে, একক চেষ্টায় কখনো বিরাট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না (বিধবা-বিবাহ আইনসঙ্গত ঘোষিত হয়েছিল কিন্তু তার ব্যাপক প্রচলন বিদ্যাসাগরের মতো প্রবল ব্যক্তিত্বও কি করতে পেরেছিলেন? সতীদাহ প্রথা বিরোধ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন—দুইই মানবতামূলক সংস্কার, কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্যের বিচারে দুটিতে এত তফাৎ কেন?) দেশের অর্থনৈতিক ও সমাজজীবনের চরিত্র ও চেহারার গভীর পরিবর্তন না হ'লে রামমোহন-বিদ্যাসাগর শত চেষ্টা করেও নবজাগরণের অন্যতম কারণ হতে পারতেন কী? এই সার সত্য উপলব্ধি করেননি বলেই লেখক সমাজ ও ইতিহাস থেকে ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন এবং আবেগ-তাড়িত ভাষায় বলেন, 'রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ইংরাজী-নবীশ না হইয়া যদি গ্রাম্য সমাজ ও টোল-চতুষ্পাঠীতে সারাজীবন অতিবাহিত করিতেন তাহা হইলেও অন্তরাগ্নির তেজে চারিদিকে বহ্নুৎসব সৃষ্টি করিতে

পারিতেন' (পৃ. ৩৫৪)। হয়তো পারতেন, কিন্তু তাতে দেশের বড় কোন পরিবর্তন হত না, নিজেরাই সেই বহ্যুৎসবের নীরব দর্শক হতেন।

লেখক নবজাগরণ প্রাসঙ্গিক কতকগুলি সিদ্ধান্ত খুব সহজেই করেছেন। সিদ্ধান্ত সরলীকরণের এবংবিধ উদাহরণ :

> 'নবজীবনের বাণী কিভাবে ধীরে ধীরে সমাজে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, দু' একটি সমসাময়িক ঘটনায় তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। ১৮২২ সালে বাখরগঞ্জে জলপ্লাবনের ফলে প্রচুর ক্ষতি হয়; কলিকাতার ইংরাজ ও বাঙালীরা সমবেতভাবে চাঁদা তুলিয়া বন্যাক্লিষ্ট নর-নারীকে প্রেরণ করেন। ১৮২৪ সালে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কলিকাতায় একটি কমিটি গঠিত হয়। নূতন জীবনের কলোচ্ছ্বাস যে সমাজে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার আর-একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সিংহবাহিনীর পূজা উপলক্ষে ১৮২৬ সালে স্বরূপচন্দ্র মল্লিক অযথা আড়ম্বরে অর্থ ব্যয় না করিয়া 'দুঃস্থ ঋণগ্রস্ত কারাগারস্থ, অনেক লোককে অনেক অর্থ প্রদানপূর্বক মুক্ত করিয়াছিলেন'।' (পৃ. ৮৬)

এবং

> 'শুধু সমাজের উচ্চস্তরে বা শিক্ষিত সমাজেই নহে, গণমানসেও যেন একটা অভিনব ভাবের বন্যা আসিয়াছিল।' (পৃ. ৮৬)

কারণ

> '১৮২৭ সালে কলিকাতায় ঠিকা বেহারাগণ সরকারী আদেশের প্রতিবাদে ঐক্যবন্ধ হইয়া পালকি বহিবার কাজ একেবারে বন্ধ রাখিয়াছিল।' (পৃ. ৮৬)

কিন্তু নবজীবনের বা নবজাগরণের বাণী কি এত সহজ শ্রোতব্য? উপরি-উক্ত 'হিউম্যানিট্যারিয়ান' কাজগুলিতেই কি নবজাগরণের বাণী মুখর হয়ে উঠেছে? তা হলে তো প্রত্যেক শতকেই একাধিক রেনেশাঁস হয়ে থাকে।

তা ছাড়া ঐ ধরনের 'হিউম্যানিটেরিয়ানিজম্' যদি তাৎকালিক সমাজের মৌল বৈশিষ্ট্য হতো তা'হলে ১৮৩০ সালে নদীয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র কর্তৃক বানরের বিবাহে এক লক্ষ টাকা খরচ করে খ্যাতি অর্জন করার ঘটনা জানা যেত না। কিংবা ১৮৫৫ সালে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় পাওয়া যেত না কালীপ্রসন্ন সিংহের সক্ষোভ উক্তি :

> 'কেহ কোন ব্যয়সাধ্য সৎকর্ম্মানুষ্ঠানার্থে তাহারদিগর নিকট যথাকিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করিলে কখনই তাহাতে সম্মত হয়েন না। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় তাহারা স্বীয় বারাঙ্গনা ও সুরা সেবন প্রভৃতি উপলক্ষে দিন দিন অকাতরে যে ব্যয় স্বীকার করেন, তদ্বারা অশেষ প্রকার দেশের হিতসাধন ও মঙ্গলবর্দ্ধন হইতে পারে। কোন কোন স্থানে বারয়ারি পূজোপলক্ষে বৎসর বৎসর যাহা ব্যয় করিয়া থাকেন, তদ্বারা অনায়াসেই পাঠশালা সংস্থাপিত করিয়া বালকবৃন্দের জ্ঞানানু-শীলন, লোকদিগের গমনাগমনোপযোগী বর্ম্ম, দুর্দ্দান্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পীড়া শান্তির নিমিত্ত ঔষধালয়, পিপাসাতুর ব্যক্তিদিগের তৃষ্ণাশান্তির নিমিত্ত পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি পরমোপকারজনক সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দেশোজ্জ্বল করিতে পারে।'

সুতরাং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজ-জীবনে 'হিউম্যানিটেরিয়ানিজম' সংক্রামিত হয়েছিল—এবং তা নবযুগের লক্ষণ—এ কথা মনে করার কোন হেতু নেই। ইতস্তত যে

দু-একটি ঘটনা পাওয়া যায় (ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় পূর্বে উল্লিখিত) তাদের ব্যতিক্রম হিসাবেই গণ্য করা উচিত।

স্থান-সঙ্কীর্ণতা হেতু তথ্য বা মন্তব্য প্রসঙ্গ বেশিদূর প্রসারিত করা সম্ভব নয়। অতঃপর ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা-রীতি সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা যাক। প্রথমত, তাঁর ভাষা বিষয়ানুগ নয়। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভাষা ঋজু ও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অকারণ উপমা উৎপ্রেক্ষা সমাসবন্ধ পদবন্ধ বর্জনীয়। লেখকের ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপমা উৎপ্রেক্ষার ভারে শ্লথগতি। 'ছায়াধূসর মধ্যযুগীয় জীবনবোধ', 'রণরঙ্গমুখর আধুনিক জীবনের রাজপথ', 'রামমোহনের চেতনার বিদ্যুৎস্পর্শ মধ্যযুগীয় ভারতের বুকে রূঢ় আঘাত হানিয়াছিল' (বিদ্যুৎস্পর্শের রূঢ় আঘাত?), 'নবজীবনের বজ্রস্তনিত আকাশ', 'নবজীবন ও ভাবাদর্শের অকৃপণ প্রাচুর্য্য বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মত বাঙালীর চিত্ততলশায়ী জড়তার ঐরাবতকে কোন শূন্যে ভাসাইয়া লইয়া চলিল' প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখনীয়। দ্বিতীয়ত, সাধুভাষা ব্যবহারের জন্য তাঁর রচনাভঙ্গী আরও দুর্বল মনে হয়। সাধুভাষার নকলগড় তো অনেকদিন আগেই ধূলিসাৎ হয়েছে, এখনো তার স্মৃতিভার বহন করা কেন? তা ছাড়া তথ্যেরও দু' চারটা ভুল আছে। যেমন, নিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্র নয়, বীরভদ্র, "সংবাদ-প্রভাকর"এর সূত্রপাত ১৮৩১ সালে নয়, ১৮৩০ সালে (রামগতি ন্যায়রত্ন : ১৬ই মাঘ ১৭৫২ শক এবং শিবনাথ শাস্ত্রী : ১২৩৭ বঙ্গাব্দে বা ইংরাজী ১৮৩০ সালে), ইত্যাদি।

৫

সমালোচক-মহলে যে-একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় তা হলো, কাছের জিনিসকে বিচার করা খুবই শক্ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে-বিচার একপেশে বা সংস্কার-মলিন হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে দূরের জিনিসকে বিচার করাও কী দুরূহ নয়? আমাদের বর্তমান খারাপ, অতিশয় খারাপ, আর আমাদের অতীত তুলনাবিহীন, গৌরব-ভাস্বর। কাল-দূরত্বের বর্ণিল বাতাবরণ-ই এই ধরনের মনোভাবের স্রষ্টা। উনিশ শতকের বাংলায় অনেক স্মরণীয় মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অনেক সামাজিক ও ধর্মনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সাহিত্যে কিছু নতুন সুর শোনা গিয়েছিল, অতএব উনিশ শতক যুগ হিসাবে অনিন্দ্য অতুল, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর পশ্চাতে শুধু শ্রদ্ধা ও বিস্ময়-ই আছে, বিজ্ঞান নেই। উনিশ শতকী নবজাগরণ বাংলাদেশের মুসলিম সমাজকে বাদ দিয়ে হয়েছিল, নবজাগরণের বৈতালিক শিক্ষিত সম্প্রদায় —যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত—ইংরেজ শাসকের শোষণকারীর ভূমিকা আদৌ লক্ষ্যই করেননি। ত্রাণকর্তারূপে ইংরেজ শাসকের তাঁদের শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল অসামান্য; এমন কি ঈশ্বর গুপ্তের মতো স্বদেশপ্রেমী কবিও সিপাহী-বিদ্রোহে ব্রিটিশের জয় কামনা করে পদ্য বেঁধে-ছিলেন ('মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়'—দিল্লীর যুদ্ধ)।

ইংরেজের মাধ্যমে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে উনিশ শতকের বাঙালি চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে বিশেষ লাভবান হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই; ইংরেজ শাসনের এই শুভ দিকটার প্রতি তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন। ব্যাপক জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নমনস্কতা, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল, বস্তুতান্ত্রিক মনোভাব, প্রত্যেক জিনিসকে বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়ার প্রবৃত্তি, মানবচেতনা প্রভৃতি রেনেশাঁস-সুলভ বহু গুণ-বৈশিষ্ট্য সেদিন শিক্ষিত সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়-

কুমার, রাজেন্দ্রলাল বা ইয়ং বেঙ্গলের সভ্যগণ সেই গুণ-বৈশিষ্ট্যের-ই ব্যক্তি-প্রমূর্তি। সমকালীন গ্রন্থজগৎ বা পত্র-পত্রিকাসমূহ নবীন মানসতার পরিচায়ক।

কিন্তু উনিশ শতকের সাহিত্য-সংসারের তথা সাংস্কৃতিক জগতের এই প্রশংসাযোগ্য দিক নিয়েই শুধু উচ্ছ্বসিত হলে চলবে কেন? রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্রবল ব্যক্তিত্ব বা ধীশক্তি যতখানি সত্য ঠিক ততখানিই সত্য ভবানীচরণ ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীনলগ্নতা। সাহিত্যপ্রসঙ্গে বলা যায়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে (এবং কিয়ৎপরিমাণে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও) সাহিত্যরুচির দু'টি সুস্পষ্ট মেরু-বিপরীত ধারা বহমান ছিল। একদিকে রামমোহনের বিতর্ক ও বিচারমূলক রচনাবলী ও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, বিদ্যাসাগরের "বোধোদয়", "সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব", "জীবনচরিত" বা "শকুন্তলা", "বেতাল পঞ্চবিংশতি"র অনুবাদ, অক্ষয়কুমারের "ভূগোল", "বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার"-এর মতো জ্ঞানগর্ভ বই প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি "নববিবি বিলাস", "দূতীবিলাস" বা "রসতরঙ্গিনী", "বেশ্যারহস্য" প্রভৃতির মতো কামায়ন-পর্যায়ের গ্রন্থকেও পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে দেখা যায় (লঙ সাহেবের ক্যাটালগে ১৮১৫—৫৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তক-তালিকা আদিরসাত্মক অশ্লীল গ্রন্থের প্রাচুর্য লক্ষণীয় এবং সমসাময়িক পত্রপত্রিকাতেও তাৎকালিক নিম্নরুচি নিয়ে অনেকের অভিযোগের সাক্ষ্য মেলে); একদিকে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বা "বিবিধার্থ সংগ্রহে" প্রকাশিত দর্শন বিজ্ঞান পুরাবৃত্তেতিহাস, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর স্বাদ গ্রহণে সেকালের বাঙালিসমাজ যেমন উন্মুখ ছিল, তেমনি "সম্বাদ-রসরাজে"র মতো হীনরুচি পত্র-পত্রিকার অশ্লীলতায় মজে থাকতেও তার কম আনন্দ ছিল না। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই দ্বিধার সাহিত্যরুচি সম্পর্কে বলেছেন:

> 'একদিকে যেমন রামমোহন ও তাঁর বিরোধীদল তর্ক-বিতর্কের দ্বারা বাঙালীর বহুকালসুপ্ত ধীশক্তিকে খরতর করিয়া তুলিতেছিলেন, শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোলগুলি জনচিত্তে বৃহদ্‌বিশ্ব সম্বন্ধে কৌতূহল সঞ্চার করিতেছিল, নানা পত্র-পত্রিকায় বিশ্ব ও স্বদেশ সম্বন্ধে নানা সংবাদ বাহির হইতেছিল এবং জগতের চলোর্মিমুখর প্রাণধারা গৃহাগতপ্রাণ বাঙালীর অলস-জর্জর জীবনে নবীন কর্মোদ্যম বহিয়া আনিয়াছিল, ঠিক তেমনি আবার তাহার পাশে সমান্তরাল রেখায় আদিরসের পূতিগন্ধদূষিত পঙ্কস্রোতও বহিতেছিল। (পৃ. ১৩২)

শুধু রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে কেন ধ্যানন, মনন ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রেও সেকালের বাঙালি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ইয়ং বেঙ্গলের সভ্যদের মতো একদল বাঙালি যেমন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ল, তেমনি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্তের মতো অপর দল সনাতন হিন্দু ধর্মের আচার-নিষ্ঠার সঙ্গে নিবিড়ভাবেই সংলগ্ন হয়ে রইলেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য কয়েকটি ঘটনার সাহায্যে প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন যে এঁদের মনোদর্পণেও নবজীবনের ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু ভবানীচরণ ঈশ্বর গুপ্তেরা যে মূলত প্রাচীন হিঁদুয়ানির ধারক বাহক ছিলেন, দৃষ্টিভঙ্গী বা জীবনাদর্শগতভাবে যে তাঁরা রামমোহন বিদ্যাসাগরের বিপরীত মেরুতে বাস করতেন তাতে সন্দেহ কি? চরম প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিও মাঝে-মধ্যে যদি দৈবক্রমে দু'চারটি প্রগতিমূলক কাজ করে ফেলেন—এবং অনেক সময় করেনও—তবে কি তাঁকে প্রগতিশীল বলে অভিহিত করা চলে?

৬

সুতরাং যুগ হিসাবে উনিশ শতক বাংলার ইতিহাসে সমালোচনা-অতীত বা অনিন্দ্য অতুল এমন মনে করার কোন কারণ নেই। ভালো-মন্দ সব যুগেই থাকে, উনিশ শতকেও ছিল। ইংরেজ বাংলা দেশের পক্ষে আশীর্বাদ ও অভিশাপ উভয়েরই কারণ হয়েছে। বাংলা-দেশের নবজাগরণের ভালো ও খারাপ উভয় দিকই আছে। বাঙালি ঐতিহাসিক ও মনন-শীলদের নিরাসক্ত মন নিয়ে উনিশ শতকের নবজাগরণ সম্পর্কে চিন্তাগর্ভ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজস্ব মূল্যে খুব বিশিষ্ট নয়। সেদিক থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশে নবজাগরণ (অবশ্য খণ্ডিত) যদি এসে থাকে তবে তা এই সময়েই। কিন্তু সেই দ্বিতীয়ার্ধের পটভূমি বা প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ তাৎপর্য বিশিষ্ট। সেই কারণেই ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান গবেষণা-গ্রন্থখানি মূল্যবান। অন্যান্য বইয়ের মতো দোষ-ত্রুটি এ বইয়েও আছে (আগে কিছু কিছু উল্লেখ করেছি), কিন্তু এই বইয়ে লেখকের তথ্যনিষ্ঠা ও প্রভূত পরিশ্রমের দুর্লভ স্বাক্ষর আছে।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বুকল্যাণ্ড। কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা।

সমালোচনা

Lolita *By* Vladimir Nabokov. G. P. Putnam's Sons. New York. $ 5.

মুস্কিল হলো *Lolita* নিয়ে কথা বলতে গেলেই বাঙালি জিভে 'ললিতা' এসে যায়, যার আলোড়ন-আবেদন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভাষার প্রসঙ্গ এড়িয়ে নামের দ্যোতনা অনুভব করা অসম্ভব। ফরাসিতে হোক, ইংরেজিতে হোক, অথবা চেকভ-তুর্গেনিভের ভাষায় হোক, বিশেষ-একটি নাম বিশেষ-একটি ইতিহাসকে স্মরণে নামিয়ে আনে—তার নিজের ভূগোল, নিজের পরিবেশ, নিজের বিশিষ্ট মোহমূর্ছনা। অন্য-ভাষায় সেই শিহরিত মূর্ছনার অনুরণন নেই, চুপি-চুপি কথা-বলা নেই, চোখের গভীর-বিশেষ ইশারা নেই। নিছক *Lolita* নামের মধ্য দিয়েই, নামটিকে বইয়ের ঠিক শুরুতেই Lo-li-ta এই তিনটি স্বরে ভেঙে নিয়ে, নবোকভ একটি আবহ রচনা ক'রে ফেলেন, রঙভরা একটি আকাশ। পশ্চিমি ভারি জিভে 'ল'-বর্ণ উচ্ছল ছেলেমানুষিতে ভরা; বিশেষত কোনো শব্দ বা নামের আরম্ভ যদি এই বর্ণ দিয়ে হয়, তাহ'লে তো কথাই নেই। কিন্তু এখানেই কি শেষ, 'Lo' দিয়ে জিভকে যে-মুহূর্তে আহ্লাদে গলিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে 'li' টুক ক'রে গলানো হ্রদে ডুব পড়লো। দুরন্তপনা চরমে পৌঁছলো যখন গম্ভীর 'ta'-স্বর দিয়ে নামের ঝংকার শেষ করা হলো : ঠিক যেন কেউ ঠোঁটের সামনে তর্জনী তুলে কপটশাসনের ভঙ্গি শেখাচ্ছে। সব-মিলিয়ে একটা ছুটির দিনের ভাব, পুঞ্জিত-হ'য়ে-উপস্থিত সহসা-উচ্ছলতা, একরাশ কিশোরী-কাকলি।

এটা স্পষ্ট হয় *Lolita*-র অত্যন্ত কাছাকাছি কয়েকটি শব্দের উল্লেখে : ইংরেজি 'Lo', যা বাংলাতে একমাত্র আমরা প্রকাশ করতে পারি যুগ্ম 'দ্যাখো দ্যাখো' দিয়ে; 'lullaby', যা আমাদের স্বপ্নসংগীতময় ঘুমের মহলে টেনে নিয়ে যায়; 'ta ta', হাত নেড়ে বিদায়ের স্নেহ-সম্ভাষণ; 'tra-la-la-la', 'la-la-tra-la', পশ্চিমি মানুষ হঠাৎ-খুশি হ'লে যে-অর্থহীন সুর ভাঁজে; 'lolly', বাচ্চাদের জিভ যা জলে ভ'রে আনে; ফরাসি 'ooh-la-la', বিস্ফারিত বিস্ময়ের নিষ্কাশন, জিভ দিয়ে প্রচুর শব্দ-সহযোগে।

একাধিকবার জিভের প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হচ্ছে : *Lolita*-নামকরণে, আমার সন্দেহ, নবোকভের এটাও একটি উদ্দেশ্য। প্রধান অভিজ্ঞতাগুলি যতদিন পর্যন্ত জিভের মধ্যবর্তিতায় আহরিত হচ্ছে, শৈশবের ঋতু ততদিন। *Lolita*-র শব্দব্যঞ্জনা, স্বপ্নসমারোহ আমাদের আদর ক'রে-ক'রে পিছনে টেনে নিয়ে চলে, সেই স্মৃতির সীমান্তে, যেখানে ইন্দ্রিয়দের মধ্যে জিভকেই সবচেয়ে মহার্ঘ ব'লে ঠেকে, অথচ আসলে যা স্থূলতম। *Lolita* অতএব নাবালক-পর্যায় নিয়ে প্রগল্‌ভ কাহিনী। কোনো-কোনো মানুষের ক্ষেত্রে যেমন, কোনো সমাজেরও নাবালক অবস্থা সহজে ঘোচবার নয়। *Lolita* নিয়ে যে-ঝড় উঠেছে, যে-ভুল বিশ্লেষণের মাতামাতি, তা দেখে যোগ করতে ইচ্ছে হয় যে নাবালক থাকবার অভীপ্সা প্রায় পরিকীর্ণ ব্যাধির মতো।

আরেকবার বলি, *Lolita*- নাম ছদ্মকোষ, নবোকভের এটা ব্যঙ্গকাহিনী। অনেকে অবশ্য নবোকভের পুরোনো রচনায় *Lolita*- উপাখ্যানের—এবং উপাখ্যানের স্থূল তত্ত্ব : চল্লিশোর্ধ্বের কিশোরী-লালসার-পূর্বোক্তি খুঁজে পেয়েছেন। এই আবিষ্কারের পর দ্বন্দ্বহীন

মীমাংসায় পৌঁছুতে তাঁদের ক্ষণমাত্র দেরি হয়নি : কাহিনীটি বিকারগ্রস্ত মনের ততোধিক বিকৃত প্রকাশ, সুতরাং অন্তত এই বইয়ের প্রসঙ্গে, নবোকভের সৃষ্টিক্ষমতার সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারণের প্রশ্ন উৎক্ষিপ্ত।

Lolita-বিষয়ে তরলীকৃত আরো-একটি মত শোনা গেছে, যাচ্ছে : যাচ্ছেতাইদের জন্য লেখা যাচ্ছেতাই বই (উপরের অভিমতের থেকে তফাৎ এখানে-যে যাচ্ছেতাইয়ের লেখা এমন বলা হচ্ছে না), পাশে সরিয়ে-রাখাই ভালো। অস্বীকার ক'রে লাভ নেই, *Lolita* যে-আলোড়ন তুলেছে, তার অনেকটা অংশই এই কুখ্যাতিহেতু। অথচ এটাও ঠিক যে 'যাচ্ছেতাই' মন নিয়ে—'যাচ্ছেতাই' রস আস্বাদন করার মোহে—যাঁরাই *Lolita* পড়তে গেছেন, তাঁরা সবাই হতাশ হয়েছেন। 'যাচ্ছেতাই' বিশেষণে যে-সমস্ত বর্ণনাকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, প্রথম পঞ্চাশ-ষাট পৃষ্ঠা ওল্‌টাবার পর, তাদের সামান্য আভাসও আর নেই। এবং আরম্ভে যতটুকু উল্লেখ, তাকে ন্যূনতমই বলা চলে, বিশেষ ক'রে সমসাময়িক ইওরোপীয় কিংবা মার্কিন উপন্যাসাদির সঙ্গে তুলনা ক'রে যদি দেখা যায়।

বর্ণনায় শীলতার চ্যুতি ঘটেনি, আপত্তি শুধু এই কারণে হ'তে পারে যে নবোকভ যে-তত্ত্বটি বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে আগ্রহান্বিত, তা প্রচলিত সামাজিক অনুশাসনের বাইরে। একটি মধ্যবয়সী লোক বারো-চোদ্দ বছরের কিশোরীদের যৌনসম্ভোগের আবেগে অস্থির, শ্লথদেহা এক বিধবাকে তার বিয়ে করতে রাজি হওয়া নিছক এই কারণে যে তাহ'লে মহিলাটির কিশোরী কন্যার সঙ্গে সহবাসের সুবিধে হ'তে পারে; মহিলাটির মৃত্যুর পর কিশোরীটিকে নিয়ে মার্কিন দেশের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত হোটেলে-মোটেলে পালিয়ে-বেড়ানো, দিনের-পরে-দিন, রাতের-পর-রাত এই নবকিশোরীকে সম্ভোগ লালসার উদ্ভটতম কল্পনাপ্রকাশ : কিশোরীটি সন্তানসম্ভবা হবে, কন্যার জন্ম দেবে, এই কন্যা একদিন কিশোরীবয়সে পৌঁছুবে, তখন তার সঙ্গে ফের যৌন সহবাস, তারপর তার কন্যার জন্ম ও কৈশোরপ্রাপ্তি, তারও সঙ্গে সহবাস, এই পুনঃপৌনিক সঙ্গমবৃত্ত—প্রথাগত আচরণ কিংবা অনুভূতির আওতাকে অতিক্রম ক'রে *Lolita*-র তত্ত্ব-অবতারণা। অনেকে বলবেন, বর্ণনায় বিস্তৃতি না-থাকুক, এ ধরনের চিন্তার কিংবা ব্যবহারের আলোচনাই অশ্লীলতা।

পুরনো তর্ক, তবু, ব্যাকরণের খাতিরে অন্তত, খুঁতগুলি খুঁটিয়ে বলতে হয়। গণিত কিংবা যুক্তি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন, তত্ত্বের প্রস্তাবে হিতাহিতের প্রসঙ্গ অবান্তর। তত্ত্বটির সপক্ষে কি বিপক্ষে অশ্বারোহী-পদাতিক সাজানো হচ্ছে হোক, তাতে কারো ক্ষয়ক্ষতি নেই। আরো বলা চলে, পুরো ব্যাপারটাকে যদি অন্বীক্ষিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাহ'লে ভালো-মন্দ দ্বন্দ্বের অনুপ্রবেশও আপত্তির নয়। স্কুল-কলেজের ছেলেরা দেশপ্রেম ভালো না মন্দ তা নিয়ে তর্ক করে, দর্শনের মাস্টারমশাইরা সজ্ঞানে মানুষ খুনের পক্ষে-বিপক্ষে পাণ্ডিত্যবহুল মীমাংসা প্রস্তাব করেন। ব্যক্তি এবং স্বদেশ, মানুষের এই দুই তীব্রতম অধিকারের অখণ্ডতা নিয়েই যদি বিদগ্ধতর্ক চলতে পারে, তাহ'লে, সাবালক পাঠকদের গণ্ডিতে, বিশেষ-এক যৌন-আচরণ নিয়ে আলাপ কেন সর্বনেশে হবে ভেবে পাওয়া মুস্কিল। এই বিচার থেকে অন্তত, *Lolita*-কে ফাঁসিকাঠে লট্‌কাবার কোনো সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমার আরম্ভের প্রসঙ্গে ফিরি : *Lolita* প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিহাস বিজল্পিতম্‌। সুতরাং যাঁরা উত্তেজিত হয়েছেন, তাঁরা মনের ভূত খুঁজেছেন, বনের নয়। নবোকভের পুরো ভঙ্গিই ঠাট্টার, তেরছা হাসির, এমনকি—কিছুটা ভয়ে-ভয়ে বলি—প্রচ্ছন্ন

সমাজশাসকের। লোলিটা নামটি যেমন তরল, লোকটির নাম তেমনই উদ্ভট, হাস্যকর, হামবড়া গুরুগম্ভীর : হাম্বার্ট হাম্বার্ট। এই দুই নামে যেমন সমান্তরলতা নেই, সেতু নেই, এদের সংগমাভিসারও তেমনি হেতুহীন—তাতে রুচির সমর্থন নেই, সমাজের ছাড়পত্র নেই, একমাত্র শঠতার আড়ালে তার গুটি-গুটি পা-ফেলা। অথচ হাম্বার্টের প্রকৃতির লোক সমাজে, বিশেষ ক'রে হালের মার্কিন সমাজে, বিরল নয়। সাময়িক একটি বিকারবোধকে যদি বার-বার ফিরে আসতে দেখা যায়, তাহ'লে সময়ের ছেদগুলি ঢাকা পড়তে বাধ্য, বিকারের অনবচ্ছিন্নতাই তখন তীক্ষ্ণ সত্য ব'লে মনে হয়। মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, *Lolita*-তে প্রস্তাবিত রিরংসা-সমস্যা নবোকভের সৃষ্টি নয়। বর্নর্ড শ ক্লিওপেট্রা-সীজার উপাখ্যানের একটি ব্যাখ্যা দাখিল করেছিলেন। ক্লিওপেট্রার বয়স বছর দশ-পনেরো কমিয়ে নিলে, কিংবা বিকল্পে ক্লিওপেট্রার কন্যাকে সীজারের লালসার ইন্ধন হিশেবে ধরলে, কিছুটা অত্যুক্তি হয়তো হয়, কিন্তু সমস্তটাই অসম্ভব ব'লে ঠেকে না। তা ছাড়া, গত কয়েক বছরের মধ্যেই, খবরের কাগজে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করার কাহিনী যেমন পড়েছি, স্ত্রীকে ডিঙিয়ে নিচের দিকে এক-স্তর মনোযোগ নামিয়ে আনার গল্পও সেইসঙ্গে শোনা গেছে। নবোকভ যা যোগ করেছেন তা সহবাসের পুনঃপৌনিক দর্শন। এটা নিছক ভাঁড়ামি, বিকার চরমে পৌঁছুলে কী উৎকট রূপ নিতে পারে, তার চোখে-আঙুল-দেওয়া-গোছের উদাহরণ। তিনি এতদূর পর্যন্ত যে যেতে পেরেছেন, তা ব্যঙ্গের চতুরালির আশ্রয় নিয়েছেন ব'লেই। অন্য-কোনো মধ্যবর্তিতায় তাঁর দৃষ্টান্তের সীমান্ত অনেকটা আগে নির্ধারিত হয়ে যেতো। দৃষ্টান্তকে ইচ্ছা-বিকৃত ক'রে, বিস্ফারিত ক'রে দেখিয়েছেন ব'লেই *Lolita*-র তত্ত্বকথা এতটা শীৎকারের সূচনা করেছে।

অবশ্য নবোকভের রঙ্গপ্রিয়তা এই প্রাথমিক বিদ্রূপেই নিরস্ত থাকেনি। লোলিটার কথাই ধরা যাক। আহ্লাদী ছেলেমানুষির খুশি-ছাওয়া নাম, অথচ মেয়েটি প্রায় আজন্ম পাপবিদ্ধা। মানে না-হয়েই পারে না, নবোকভের তির্যক ব্যঙ্গের উপলক্ষ্য এই দশকের মার্কিন কিশোরীদের আচার-ব্যবহার। দশ-থেকে-পনেরো বছর বয়সের কিশোরী মার্কিন পরিভাষায় sub-teen; নবোকভ রঙ্গ করে নাম রেখেছেন nymphet। রিরংসাতুর হাম্বার্ট প্রথম অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝলো যা মনে হয় তার প্রলাপবিলাসের nymphet তা নয় : ঐ কচি শরীর ইতিমধ্যেই ইন্দ্রিয়ের শ্বারের উত্তীর্ণ মহলে বহুবার বিহার ক'রে এসেছে। দেখা গেলো যাকে সে ভেবেছিল আদর ক'রে, আধো-আধো খেলার ছলে কামসূত্র শেখাবে, সেই নবকিশোরীর কাছেই তার অনেক-কিছু শিক্ষা বাকি।

দ্বিতীয় মোহভঙ্গ : যাকে স্বপ্নময়ী nymphet ব'লে ভাবতে তার সম্ভোগের মুক্তি, সেই মেয়ের মন শঠতা ও চাতুরীতে ঠাসা, বহু ঋতু-পেরোনো বারনারীর প্রতিটি বিভঙ্গ তার মুখস্থ। সংগমে সম্মত করাতে হ'লে লোলিটাকে উৎকোচে দ্রব ক'রে আনতে হয়, সে-উৎকোচ চকোলেটই হোক, পোশাকই হোক, কিংবা পয়সাই হোক। সমগ্র প্রস্তাবটি এমন হাস্যকর যে নবোকভের আপাত-অবৈকল্যে বিস্মিত হ'তে হয়। চকোলেটের সঙ্গে সংগমের বিনিময়-সম্পর্ক স্থাপন ক'রে বঙ্কিম কটাক্ষে নবোকভ এ-ধরনের যৌনসম্পর্কের একটি মূল্য নির্ধারণের ইঙ্গিত দিয়েছেন : সেই জিভের প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন, ঘুরে-ফিরে এটাই দেখানো হাম্বার্টের রিরংসা সমস্ত বিশ্লেষণেই স্থূলতম প্রকৃতির।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো জৈবিক নিয়মকে এড়ানো সম্ভব নয়, প্রচুর উৎকোচও যথেষ্ট নয়, গণিকাবৃত্তিতে সুদক্ষ কিশোরীও একদিন থমকে ভাবে : তার রক্তে নীল আকাশের

ইশারা, স্বাভাবিক জীবনবিলাসের পিপাসা, সুস্থ ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা। পাহারার মাত্রা বাড়িয়েও ধরে রাখা গেলো না, nymphet ফাঁকি দিয়ে পালালো, এখানে-ওখানে পর্যুদস্ত-প্রতিহত হয়ে পরিশেষে তার নিজের নীড় সে খুঁজে পেলো, চিঠি দিলো হাম্বার্টকে : 'Dear Dad, How's everything? I'm married. I'm going to have a baby'। তার শাদামাটা স্বামী ডিক, যুদ্ধ থেকে কালা হয়ে ফিরেছে, মজদুরি ক'রে জীবিকা উপার্জন করে, অভাবের সংসার। তবু ঐ-জীবনে কোনো গ্লানি নেই, ক্লেদ নেই, অপরাধ-বোধ নেই, এবং অপর্যাপ্ত সুখ আছে, এমনকি যৌনসুখও, যা হাম্বার্ট, কামনার উন্মত্ত তীব্রতা সত্ত্বেও, তাকে দিতে পারেনি।

সুতরাং বলতেই হয় *Lolita* শেষ পর্যন্ত সুস্থ জীবনবোধের দিকেই আমাদের দৃষ্টি ফেরায়, স্বাভাবিক যৌনসম্পর্কের মূল্যকে উপরে তুলে ধরে। এতদ্‌সত্ত্বেও যাঁরা বলবেন বইটি অশ্লীল, তাঁদের সঙ্গে বিতর্ক বাড়িয়ে বিশেষ লাভ নেই।

কেউ-কেউ *Lolita*-র শেষাংশের হত্যাকাণ্ডটিকে ঘোর অপছন্দ করেছেন, তাঁদের কাছে এই পর্বটি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, এবং অযথা বীভৎস ব'লে মনে হয়েছে। এক-হিশেবে এই মত স্বীকার্য। হাম্বার্টের জীবনপঞ্জী লোলিটার শেষ প্রত্যাখ্যানের সঙ্গেই সমাপ্ত হয়ে গেছে, হাজার অনটন ও অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও ডিককে আঁকড়ে থাকবে সে, 'dear dad'-এর প্রলাপ-পিঞ্জরে ফিরে যাওয়ার বিন্দুতম আগ্রহ নেই তার। যে-ব্যক্তি একটি অস্বাস্থ্যকে কেন্দ্র ক'রে নিজের চেতনা-কামনা-আচরণ-প্রকরণ চালনা করেছে, এই প্রত্যাখ্যান তার কাছে মৃত্যুপ্রতিম।

নবোকভ হয়তো এখানেই উপাখ্যানের ইতি টানতে পারতেন, কেন করেননি তার দুটো ব্যাখ্যা সম্ভব। লোকটির paranoid-প্রকৃতি আরো স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তোলবার খাতিরে হত্যাদৃশ্যটিকে কিছুটা সমর্থন করা যেতে পারে। যে-ব্যক্তি লোলিটাকে তার আওতা থেকে প্রথম প্রলুব্ধ ক'রে নিয়ে যায়, তাকে অবিচলিত হিংসায় হত্যা করবে সে, একটির-পর-আরেকটি গুলি করে, অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে। তার ক্ষুব্ধ রুদ্ধরতি হত্যার নৃশংসতার মধ্য দিয়ে বিস্ফোরণ হয়ে বেরোলো এই হত্যার মারফৎ নিজেকেও হত্যা করলো হাম্বার্ট : পরিপূর্ণতম চিত্তনিষ্কাশন, আত্মবিনাশ। বিকল্প ব্যাখ্যা : নবোকভ শেষ মুহূর্তে আরেকটি পরিহাস সংযোজনার লোভ সামলাতে পারেননি। যাকে খুন করা হলো সেই লেখকটি, এবং তার অনুরাগী সম্প্রদায়, আরেক-ধরনের paranoids : কে জানে, হয়তো নবোকভের ইঙ্গিত হালের 'বীটনিক'দের নিয়ে। এদের কারো-কারো চলা-বলা, জীবনযাপন এতটাই উদ্ভট যে উদ্ভট হত্যাদৃশ্যটির সঙ্গে কেমন মিলে যায়।

এতক্ষণ যা বলা হলো, তাতে *Lolita*-র আনুষ্ঠানিক আলোচনা অনেকটাই হলো হয়তো, কিন্তু তাহ'লেও বইটি সম্বন্ধে আসল কথা কিছুই বলা হলো না। সে-সবশেষের, সবচেয়ে আসল কথা *Lolita*-র ভাষাঐশ্বর্য। এমন উজ্জ্বল, শাণিত, সচ্ছল ইংরেজি গদ্য বহুদিন পড়বার সৌভাগ্য হয়নি। অথচ নবোকভ ইংরেজি মক্সো করেছেন মাত্র বছর পনেরো ধ'রে। তাঁর গদ্যের যেটা প্রধান গুণ তা তার উপলগতি; ভাষার একেবারে গহনে প্রবেশ ক'রে যেতে না-পারলে এই উচ্ছলতা অসম্ভব। বেপরোয়া ফুর্তিতে নবোকভ কথার পর কথা সাজিয়ে যাচ্ছেন, কোথাও বাধো-বাধো ভাব নেই, ভাষার সঙ্গে ভাবের সংঘর্ষ নেই, প্রতিটি পংক্তিতে কবিতার কিঙ্কিণী। এবং সেই সঙ্গে অফুরন্ত কৌতুক এসে জুটেছে। নবোকভ শব্দ নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসেন, প্রতিবেশী কোনো ধ্বনিকে পাশে বসিয়ে মজা দেখতে তাঁর ক্লান্তিহীন উৎসাহ—অথচ সমস্ত-কিছুই যেন প্রকাশের তাগিদে,

বক্তব্যের প্ররোচনায়। কলা-কৌশল কখনো কণ্ডূয়নে নেমে আসে না, অন্যদিকে কৌতুকেও ছেদ নেই। পরিহাসের ঈষৎ বক্ররেখা প্রথম-দিকের অল্ডাস হাক্সলীর কথা মনে পড়িয়ে দেয়, শব্দ ও ধ্বনির উপর দখল অবশ্যই জয়স-কে। তাছাড়া, মাঝে-মাঝে নবোকভের গদ্য যখন ছন্দে উপচে পড়তে চায়, যেমন ২৫৭-৫৯ পৃষ্ঠায় লোলিটাকে নিয়ে ছড়াটিতে, Letters from Iceland-পর্বের অডেনের সঙ্গে তখন ঘনিষ্ঠতা খুঁজতে বেগ পেতে হয় না।

মাঝে-মাঝে বর্ণনার ঐশ্বর্যে চমক লাগে। একটি-দুটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি : লোলিটা-কে নিয়ে দুরন্ত অভিসারের রাস্তায়—

Distant mountains. Near mountains. More mountains ; bluish beauties never attainable, or ever turning into inhabited hill after hill ; south-eastern ranges, altitudinal failures as alps go ; heart and sky-piercing snow-veined gray colossi of stone, relentless peaks appearing from nowhere at a turn of the highway ; timbered enormities, with a system of neatly overlapping dark firs, interrupted in places by pah puffs of aspen, pink and lilac formations, Pharaonic, phallic, "too prehistoric for words" (blasé Lo) ; bultes of black lava ; early spring mountains with young-elephant lanugo along their spines ; end-of-the summer mountains, all hunched up, their heavy Egyptian limbs folded under folds of tawny moth-eaten plush ; oatmeal hills, flecked with green round oaks ; a last rufous mountain with a rich rug of lucerne at its foot. (পৃষ্ঠা ১৫৮)

অথবা নিচের বর্ণনাটি, রাতের হোটেলের পরিবেশে-ভরা। অনেকের রুচিতে হয়তো নামঞ্জুর, কিন্তু প্রকাশের চাতুর্যে মুগ্ধ হ'তেই হয়—

There is nothing louder than an American hotel ; and, mind you, this was supposed to be a quiet, cozy, old-fashioned, homey place—"gracious living" and all that stuff. The clatter of the elevator's gate—some twenty yards northeast of my head but as clearly perceived as if it were inside my left temple—alternated with the banging and booming of the machine's various evolutions and lasted well beyond midnight. Every now and then, immediately east of my left ear . . . ., the corridor would brim with cheerful, resonant and inept exclamations ending in a volley of goodnights. When *that* stopped, a toilet immediately north of my cerebellum took over. It was a manly, energetic, deep-throated toilet, and it was used many times. Its gurgle and gush and long afterflow shook the wall behind me. Then someone in a southern direction was extravagantly sick, almost coughing out his life with his liquor, and his toilet descended like a veritable Niagara, immediately beyond

our bathroom. And when finally all the waterfalls had stopped, and the enchanted hunters were sound asleep, the avenue under the window of my insomnia, to the west of my wake—a staid, eminently residential, dignified alley of huge trees—degenerated into the despicable haunt of gigantic trucks roaring through the wet and windy night. (পৃষ্ঠা ১৩১-১৩২)

সবশেষে আমি নবোকভের নিজের জবানিতে ফিরবো; বইটি লিখেছেন নিজের খুশির তাগিদে, কেন লিখেছেন সেটাই তার সর্বোত্তম উত্তর। হয়তো তাঁর রঙ্গ করতে ইচ্ছে হয়েছিল, তির্যক ইঙ্গিতে বিদ্রূপ লিপিবন্ধ করতে, কিংবা, এমনকি, একটি বিকৃত যৌন আবেগ বিষয়ে নীতিকথা শোনাতে। উপভোগের মুহূর্তে এ সমস্ত উত্তরকাহিনীই উহ্য। নীতিবোধের কর্কশ জটিল রাজ্যে পা না-ঢুকিয়ে, এই সরল সূত্র আমরা মেনে নিই না কেন? আজ থেকে বছর-পঁচিশ আগে বুদ্ধদেব বসু এক গল্পে ঠাট্টার সুরে একটি ছড়া বানিয়েছিলেন : 'ওগো ললিতা, প্রাণের প্রদীপে মোর তুমি সলিতা'। *Lolita* উপাখ্যানের উত্তমপুরুষ হাম্বার্টের লোলিটা-অনুরাগও, প্রসঙ্গ যতই ভিন্ন হোক না কেন, 'প্রাণের প্রদীপে মোর তুমি সলিতা'-পর্যায়ের।

অশোক মিত্র

Memoirs of a Dutiful Daughter *By* Simone de Beauvoir. André Deutsch and Weidenfeld & Nicolson. London. 30*s*.

সিমন দ্য বোভোয়ার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের মনে বিশেষ কৌতূহল আছে। কৌতূহল নানা কারণে। তিনি সার্ত্রের ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী। তাঁর রচনায় যে বুদ্ধির দীপ্তি ও চিন্তার স্বচ্ছতা দেখা যায় তার প্রকৃত উৎস কোথায়? হোটেলবাসিনী, অবিবাহিতা এবং একান্ন বছর বয়সেও রূপসী এই লেখিকা নিজেকে ঘিরে রহস্যের সৃষ্টি করেছেন। সেই রহস্য কিছুটা উন্মোচিত হবে আলোচ্য আত্মচরিতে।

সম্পূর্ণ হবে না, কারণ সার্ত্রের সঙ্গে পরিচয় হবার পরই কাহিনী শেষ হয়েছে। এখানে আমরা লেখিকা ও অস্তিত্ববাদের সমর্থক সিমনকে দেখতে পাই না। জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কেমন করে তিনি বৃহত্তর জীবনের প্রবেশ-পথে এসে উপস্থিত হয়েছেন "মেময়র্স্ অব এ ডিউটিফুল ডটার" তারই ইতিহাস।

সিমনের ব্যক্তিগত জীবনের আকর্ষণ যত বড়ই হোক সাহিত্যের বিচারে তা গৌণ। তাঁর স্মৃতিকথা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। "দি সেকেণ্ড সেক্স" ও "দি মান্দারিন্স্"-এর প্রাখর্য এখানে নেই; কিন্তু স্মৃতিরোমন্থনের স্নিগ্ধ মাধুর্যে বইটি সহজেই পাঠকের মন স্পর্শ করবে।

১৯০৮ সালে সিমনের জন্ম হয়। তাঁদের পরিবারের বংশমর্যাদা যত বড় ছিল, আর্থিক সঙ্গতি সে পরিমাণ ছিল না। তাঁর বাবা প্যারিসে ওকালতি করতেন; কিন্তু কাজের চেয়ে তাঁর বেশী উৎসাহ ছিল অভিনয়ে। বই পড়তেও খুব ভালোবাসতেন। সাড়ে পাঁচ বছর

বয়সে সিমনকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। স্কুলের পড়া তিনি কখনো অবহেলা করেননি। খেলার সময়ও সিমন কখনো লঘুচিত্ততার পরিচয় দেননি। সর্বদা নিয়মকানুন মেনে চলেছেন। তাঁর পুতুলরা আবোল-তাবোল বকত না, তাদের কথাবার্তা ছিল মানুষের মত যুক্তিপূর্ণ। সিমনের পুতুলের সংসারে স্বামীর স্থান ছিল না। মা সন্তান মানুষ করছে দেখা যেত; কিন্তু বাবা সব সময়ই বিদেশে। স্ত্রীকে স্বামীর ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে হয়,—একথা সিমন পুতুলখেলার বয়সেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং তখনই সংকল্প করেছিলেন তিনি বিয়ে করে স্বামীর দাসত্ব করবেন না। তবে শিক্ষিকা হিসাবে শিশুদের মানুষ করে তোলবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধা নেই।

স্কুলের সহপাঠিনী জাজা ছাড়া সিমনের অন্য কোন বন্ধু ছিল না। একটু বড় হবার পর খেলার আগ্রহ কমে গেল। সঙ্গী হল বই। পড়ার নেশা পেয়ে বসল তাঁকে। কিন্তু যে বই খুশি পড়বার অধিকার ছিল না। বাবার চেয়ে গোঁড়া নীতিবাদী ছিলেন মা। তিনি যে বই অনুমোদন করে দিতেন শুধু সে বই পড়া চলত। যে পাতাগুলি অবাঞ্ছিত মনে হত মা সেগুলি পিন দিয়ে আটকে দিতেন। মনে আছে, ওয়েলসের "দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডসের" একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় মা নিষিদ্ধ করেছিলেন। পিন খুলে সিমন মা'র নির্দেশ কখনো অমান্য করেননি।

বই তাঁর কাছে একটি নতুন জগতের দ্বার মুক্ত করে দিল। ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বইগুলি পড়তে লাগলেন একে একে। উপন্যাসের নায়িকাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখতে তাঁর ভালো লাগত। "মিল অন দি ফ্লস্"-এর নায়িকা ম্যাগি টুলিভারের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ মিল খুঁজে পেয়েছিলেন।

মা-র উপদেশ সিমনকে ছেলেবেলা থেকেই ধর্মভীরু করেছিল। মাসে দু'বার তিনি নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি জানিয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতেন। কিন্তু বই পেয়ে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ কমে গেল। ধর্ম এবং ঈশ্বরের স্থান অধিকার করল বই। ভালো বই তাঁর কাছে বাইবেলের মর্যাদা পেল। যে বই ভালো লাগত তা বারবার করে পড়তেন; বই থেকে উপদেশ গ্রহণ করতেন; ভালো ভালো অংশগুলি খাতায় লিখে রাখতেন; পড়তে পড়তে কত বাক্য ও অনুচ্ছেদ মুখস্থ হয়ে যেত। বই পড়ে কখনো চোখের জলে বুক ভেসে যেত, কখনো মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠত। সিমন ভাবতেন, বই যতদিন আছে ততদিন জীবনের সুখ তো আমার হাতের মুঠোয়। সুখের জন্য আর কিছুর উপরই নির্ভর করতে হবে না।

এত বই পড়লেও সিমনের লেখা ছিল খুব কাঁচা। বন্ধু জাজা একবার ঠাট্টা করে বলেছিল, 'তোর চিঠি তো নয়, মনে হয় ক্লাসের রচনা খাতার একটা পাতা ছিঁড়ে ডাকে দিয়েছিস্।' সিমনের তুলনায় ক্লাসের অনেক মেয়ের ভাষা বেশ ভালো ছিল। মনের গভীরতম অনুভূতির কথা পছন্দ মতো ভাষায় প্রকাশ করা তাঁর কাছে কঠিন মনে হত। বারেসের কথা বারবার তিনি বলতেন : Why have words, when their brutal precision bruises our complicated souls?

মনের অনুভূতিকে যথার্থরূপে শব্দে প্রকাশ করা এত কঠিন উপলব্ধি করেও মাত্র পনেরো বছর বয়সেই সিমন সংকল্প করলেন তিনি লেখিকা হবেন। একদিন তাঁর এক বন্ধু আলবাম এগিয়ে দিল; তাতে কতকগুলি প্রশ্ন ছিল, তার জবাব দিতে হবে। একটা প্রশ্ন : ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি কী হতে চাও? সিমন উত্তর লিখলেন : বিখ্যাত লেখিকা। তিনটি কারণ তাঁকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রথমত, বইয়ের অপূর্ব জগৎ

যাঁরা সৃষ্টি করেন তাঁদের প্রতি সিমনের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। দ্বিতীয়ত, বাস্তব জীবনে তাঁর বেশী লোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। লেখার মধ্য দিয়ে বহুত্তর সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে। তৃতীয়ত, লেখার মধ্যে নিজেকে নব নব রূপে সৃষ্টি করা যায়, প্রসার করা যায়।

এদিকে স্কুলের পড়ায় সিমন সবাইকে পেছনে ফেলে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে লাগলেন। মা-বাবার দুঃখ, সিমন যদি ছেলে হত তা হলে কত উন্নতি করতে পারত। বাবা বলতেন, আমার মেয়ের মাথা পুরুষের মতো, পুরুষের মতো তার চিন্তা-ভাবনা, সে তো মেয়ে নয়,—ছেলেই।

পুরুষের সমকক্ষ হিসাবে দেখার চেয়ে বড় সম্মান মেয়েদের আর নেই। পুরুষের পাশে দাঁড় করে মেয়েদের বিচার করা হয়। তাদের নিজেদের মূল্য দিয়ে বিচার করবার রীতি নেই। এরই বিরুদ্ধে সিমন "দি সেকেণ্ড সেক্স"-এ বিদ্রোহ করেছেন।

মেয়ে খুব বেশী পড়ুক তা মা'র ইচ্ছা ছিল না। সম্ভ্রান্ত ফরাসী পরিবারে তখন মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেবার আগ্রহ নিন্দনীয় ছিল। তথাপি নিজের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাবার সমর্থন যুক্ত হওয়ায় পড়া বন্ধ করতে হয়নি।

দেহ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যৌনচেতনা জাগতে লাগল। নানা বিষয়ে কৌতূহল। দু'একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে যৌনবিষয়ক আলাপ-আলোচনা হত। মা যখন একদিন মেয়েদের পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য কয়েকটি কথা বলতে এলেন তখন সিমন বললেন, 'এসব কথা আমি জানি।'

দূর সম্পর্কের আত্মীয় যাঁকের প্রতি সিমন গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। যাঁকও ছাত্র; প্যারিসের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। আধুনিক লেখকদের যে-সব বই বাড়িতে নিষিদ্ধ তাদের সঙ্গে সিমন পরিচিত হলেন যাঁকের সহায়তায়। যাঁকের সঙ্গে গল্প করতে বেড়াতে তাঁর ভালো লাগত। ভাবতেন এই বুঝি ভালোবাসা। মা যাঁককে পছন্দ করতেন না। মেয়েকে ওর সঙ্গে মেলামেশা করতে বাধা দিতেন। মেয়েদের অসহায়তার কথা উপলব্ধি করে সিমন ক্ষুব্ধ হতেন; বাধা পেয়ে যাঁকের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেড়েই চলল।

কিন্তু তাঁর প্রতি যাঁকের আকর্ষণ মুখর নয়। সিমন চিঠি লেখেন, যাঁকের কাছ থেকে জবাব আসে না। পুরুষের চরিত্র অনুভূতির সংযমের উপরেই নির্ভর করে, এই ছিল যাঁকের বিশ্বাস। একদিন সে সিমনকে শুনিয়েছিল গ্যেটের কথা, I love you ; is that any business of yours? এই নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও সিমনের মনে যাঁকের প্রভাব শিথিল হয়নি। কিন্তু যাঁক যখন কয়েকবার পরীক্ষায় ফেল করবার পর উত্তর আফ্রিকায় চাকরি নিয়ে চলে গেল তখন ভরসা করবার আর কিছুই রইল না।

শুধু বই নিয়ে যৌবনের স্বপ্ন পূর্ণ হয় না। একটি সঙ্গীর জন্য মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। সিমন হয়ত দেখতে পেলেন একটি তরুণ একটি তরুণীর কাঁধের উপর হাত দিয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে পথ চলছে। অমনি তাঁর মনে হত এমন একটি তরুণ সঙ্গী তিনিও যদি পেতেন! কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সঙ্গী তিনি কেন পেলেন না? যে-সব মেয়েদের বিয়ে হয় তারা বোধ হয় অন্য জাতের। ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির দীপ্তি যে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে তার জন্যই তিনি একা। অথচ যাঁক বলত সকলের মতো হওয়াতেই আছে সুখ, The secret of happiness and the very height of artistic achievement is to be like

everybody else, yet to be like no one on earth.

সকলের মতো হয়েও নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার কৌশল সিমন শেখেনি।

অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তিনি প্যারিসের রেস্তোরাঁয় রেস্তোরাঁয় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। মদের গ্লাশ হাতে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন; গল্প করতেন নানা ধরনের লোকের সঙ্গে। এমনি শিথিল জীবনযাপনের ফলে তাঁকে বিপদে পড়তে হয়েছিল। একবার একটি লোক গাড়ী করে সিমনকে শহরের বাইরে নির্জন জায়গায় নিয়ে এল। তখন অনেক রাত হয়েছে। সিমন তার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে পালিয়ে শেষ গাড়ী ধরে বাড়ি ফিরে এলেন। আর একদিন কয়েকজন উচ্ছৃংখল চরিত্রের যুবক রেস্তোরাঁয় তাঁকে খাওয়াল। গল্প করতে করতে রাত হল অনেক। বাড়ি ফেরার জন্য তিনি পথে বেরিয়ে এলেন। যুবকরাও এসেছে তাঁর সঙ্গে। তারা বলল, বাঃ, পয়সা খরচা করে আমরা খাওয়ালাম, আর তুমি ফাঁকি দিয়ে বাড়ি চলে যাবে! তা হবে না, চলো আমাদের সঙ্গে। বে-গতিক দেখে সিমন রাস্তা দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলেন। ওরাও ছুটছে। সেদিন কি হত বলা যায় না। হঠাৎ পুলিশ এসে পড়ায় সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন।

যাঁক আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে সিমনের বন্ধুত্ব ভুলে গেল; বিয়ে করল অন্য একটি মেয়েকে। জাজা ভালোবেসেছিল তার এক সহপাঠীকে। পারিবারিক সংস্কার তাদের মিলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় সে মৃত্যু বরণ করল। এই দুটি ঘটনা গভীর-ভাবে আঘাত করেছিল সিমনকে। বিশেষ করে জাজার করুণ মৃত্যু তাঁর মন থেকে প্রেম ও বিবাহের স্বপ্ন দূর করে দিল। তিনি বলেছেন, জাজা তার মৃত্যু দিয়ে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

পুরনো বন্ধুরা বিদায় নিল। এবার আলাপ হল সার্তের সঙ্গে। শুরু হল তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়। সার্ত বললেন, From now on, I'm going to take you under my wing. সিমনও সানন্দে তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন। সার্ত তাঁকে লিখতে উৎসাহ দিয়েছেন; বলেছেন, অন্য সব আকর্ষণ ত্যাগ করে উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য আপ্রাণ সাধনা করতে। কারণ, when one has something important to tell the world, it is criminal to waste one's energies on other occupations. The work of art or literature was, in his view, an absolute end in itself; it was a law unto itself, and its creator was a law unto himself . . .

লেখিকা প্রশংসনীয় সংযমের সঙ্গে নিজের কথা বলেছেন। আত্মম্ভরিতা, ভাবালুতা অথবা বাচালতা নেই কোথাও। নির্লিপ্ত দর্শকের মতো জীবনকে তিনি দেখেছেন।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী—ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত। মূল্য বারো টাকা। ক্যালকাটা বুক হাউস। কলিকাতা-১২।

ঈশ্বর গুপ্ত সুশিক্ষিত ছিলেন না। অশিক্ষিতপটুত্বের পুরুষার্থ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলেই উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর নির্বিচার ভাববিলাসের দাসত্ব তাঁকে করতে

হয়নি। বাঙলা দেশে ইংরেজ শাসনে বুর্জোয়াতন্ত্রের অপূর্ণতায় যে সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্ম, তাতে স্বাধিকার বোধের প্রশ্রয় থাকলেও বৃহত্তর সামাজিক সমর্থন ছিলো না। তার ফল, আজকের দিনেও মনে হয়, সর্বথা ভালো হয়নি। শিক্ষিতদের অর্বাচীন সাংস্কৃতিক অন্বেষণে দেশজ মনোবৃত্তি আর লোকচৈতন্যের সূত্র স্বীকৃত হলো না—ক্লাসের (class) সঙ্গে মাসের (mass) যুক্তিসম্মত সম্বন্ধক্ষেপের শুভবুদ্ধি ও সুস্থ মনোভাব তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। অথচ তখনও জন-জীবনের দৃষ্টির আশ্চর্য ফলন দেখি যাত্রা, পাঁচালী ও কথকতার আসরে—পট, পুতুল ও আল্পনার শিল্পচর্চায়—ব্রতকথা, ছড়া আর রূপকথার লৌকিক সাহিত্যকর্মে।

এই পূর্বাগত ঐতিহ্যের দায়ভাগ থেকে বঞ্চিত বলেই আমাদের উনিশ শতকের সংস্কৃতি নিতান্তই শিক্ষিত সমাজের অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। রামমোহনের চিন্তা, কর্ম ও রচনায় যতখানি শুদ্ধবুদ্ধির চর্চা ও দৃষ্টির আবিলতার নিরাকরণ, ততখানিই তিনি নবযুগের অগ্রদূত—কিন্তু তিনি 'সকল জাতির সম্মানিত শাস্ত্র' অর্থাৎ পৌরাণিক ঐতিহ্যের অনুশীলনের দ্বারা নয়া কালের নতুন ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করলেও তাঁর মতো স্বচ্ছ-দৃষ্টি ভগীরথের চোখে বাঙালীর চিরাগত লৌকিক জীবনের সঙ্গে বর্তমান প্রদ্যুতগতি জীবনের সাযুজ্য-রক্ষার দায় ধরা পড়লো না কেন ভাবতে অবাক লাগে। অথচ সেই ঈপ্সিত সম্বন্ধবিন্যাসে—সেই কর্মঠ, প্রত্যক্ষপন্থী ও জীবনোৎসারিত প্রাকৃত কন্‌সেন্‌সনের সঙ্গে মননসমৃদ্ধ ও বৈদগ্ধ্যার্জিত আধুনিক সফিস্‌টিকেসনের বিবাহযোগে সৃষ্টির সার্থকতার প্রমাণ দেখি অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে। তাই উনিশ শতকী রেণেসাঁসের প্রারম্ভে বিরোধ অনিবার্য ছিলো—ঐতিহ্যের চেনাপক্ষের সঙ্গে নবাগত প্রাণচৈতন্যের।

ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিরোধে, সেই অনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার বিভ্রান্তির যুগে দেশজ উত্তরাধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই চেনাপক্ষ নিরাপদ ও দায়িত্ববর্জিত বলেই গুপ্তকবির আশ্রয়স্থল ছিলো না—তাঁর মতো বস্তুবাদী জীবনরসিক চক্ষুষ্মান কবি-সম্পাদকের কাছে তা আশা করা স্বাভাবিক নয়। আসল কথা, যে শ্রেণীগত ও ভাবগত সংঘাত-সংযোগে সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা পরিবর্তমান ও প্রাণবান, তাতে সচেতন মানুষ-মাত্রকেই একটা পক্ষ নিতে হয়—কিংবা দোটানায় বিধ্বস্ত হতে হয়। ঈশ্বর গুপ্ত ঐতিহ্যের চেলাগুল ধরেছিলেন, কারণ এতেই তাঁর প্রত্যয়ের স্ফূর্তি ছিলো সুনিশ্চিত। অন্য দিকটাও তাঁর চোখে পড়েছে, কোথায়ও কোথায়ও সমর্থন করতেও তিনি দ্বিধা করেননি—কিন্তু ব্যক্তিস্বরূপের দাবিতে ও নিজস্ব ঐতিহাসিক চেতনায় তিনি পূর্বাগত উত্তরাধিকারে মনের ঠাঁই খুঁজে পেয়েছিলেন। তখনকার উচ্ছৃংখলতাও বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় তাঁকে রক্ষণশীল হতে উদ্বুদ্ধ করেছে, কখনও কখনও সেই উচ্ছৃংখলতা মর্মের দাহনে তাঁকে হাসিয়েছে—তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে নির্মম হয়ে উঠেছেন। সুতরাং নিজের সামাজিক প্রাণের গরজ আর ইতিহাস-চেতনার দাপটেই ঈশ্বর গুপ্ত সংরক্ষণশীল, নিরাপদ আশ্রয়ের আশ্বাসের জন্য নয়। গুপ্তের কবিজীবনীসংগ্রহ বিচার-কালে এ-ভূমিকা স্মরণীয়।

অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত ঈশ্বর গুপ্তের কবিজীবনীসংগ্রহের মূলে যে ঐতিহ্যাশ্রয়ী দৃষ্টির অনুপ্রাণনা, তার পরিচয় দিতে গিয়ে রঙ্গলালের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। তাতে তখনকার আবহাওয়ার সুন্দর পরিচয় পাওয়া গেলো। কিন্তু গোষ্ঠী-পরিচয়ের চাইতেও প্রয়োজন ছিলো ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিমানসের শিকড় সন্ধান—তার সামগ্রিক রূপের বিকাশন। সেই দায়িত্ব সম্পাদক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন

করেছেন। তাঁর একটি মন্তব্য মৌলিক এবং প্রায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সামিল : 'একদা ধর্মসভার অনুগামী রক্ষণশীল ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম সংরক্ষণের প্রতি উৎসাহে একদিকে খৃষ্টি ধর্মান্দোলনের বিরুদ্ধে টম পেইনের *Age of Reason*-এর অনুবাদ করেছিলেন, তেমনি হিন্দু কলেজের প্রতিকূল মন্তব্যের ফলে তাঁর মামলায় জড়িয়ে পড়ার উপক্রমও হয়েছিল। এই ঈশ্বর গুপ্তই প্রায় কুড়ি বছর পরে ধর্মসভার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন এবং স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদি সমাজ-সংস্কার কিছু কিছু সমর্থন করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের এই পরিবর্তনকে বাঙালী মানসের অনাতিদ্রুত পরিবর্তনের প্রতীক বলেই মনে করি।' ঈশ্বর গুপ্তের মনোবিকাশের এই সামাজিক প্রতীকধর্মিতা নির্ণয় এখানে স্মরণ-বাণী হয়ে উঠেছে।

নির্বিবাদ অতীত-প্রীতি বা ঐতিহ্য-মমতা প্রশংসার্হ নয়, কিন্তু যুক্তিভিত্তিক ইতিহাস-চেতনায় অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত নিশ্চয়ই ঈশ্বর গুপ্তের মননমগ্নতার পরিচায়ক, তাঁর অবজেক্‌টিভ্ দৃষ্টিভঙ্গীর বহির্প্রকাশ। উনিশ শতকী ইতিহাস-চেতনা (যা ইংরেজের মহত্তম দান) গুপ্ত কবির কবিজীবনীসংগ্রহে ইতিহাস-সংরক্ষণের রূপ নিয়েছে—ভবতোষ দত্ত-র এই সিদ্ধান্তে তথ্যের উপযুক্ত সমর্থন আছে; কারণ ঈশ্বর গুপ্ত কেবলমাত্র কতকগুলি গালগল্প বা জনশ্রুতি সংকলন করে যাননি—তখনকার পক্ষে যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মতভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সন তারিখ স্থান ঘটনার ক্রম ইত্যাদি যথাযথ বর্ণনা করবার চেষ্টার ত্রুটি করেননি, বিশেষতঃ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ রচনার সময় নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। ভবতোষ দত্ত দেখিয়েছেন, 'যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ, সনন্দ প্রভৃতি দলিল পরীক্ষা এবং কিম্বদন্তীর সাক্ষ্যং—মোটামুটি এই তিনটি ছিল ঈশ্বর গুপ্তের গবেষণার পদ্ধতি। প্রথম ও তৃতীয়টি পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যের গবেষকদের নিকট পরম মূল্যবান। কারণ এই দুটির সুপ্রচুর ব্যবহার ঈশ্বর গুপ্ত যদি না করতেন, তা হলে কালের সঙ্গে তারা চিরদিনের জন্যই লোপ পেত। দ্বিতীয় পদ্ধতিটিও খুবই মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু হয়তো অতটা নিশ্চিহ্নপ্রায় ছিল না। এই দলিল পরীক্ষা করেই ইদানীং ভারতচন্দ্রের জীবনের ঘটনায় নতুন সংকেত পাওয়া যাচ্ছে।' ঈশ্বর গুপ্তের গবেষণার তিনটি পদ্ধতির মধ্যে কিম্বদন্তী সম্পর্কে ভবতোষ দত্ত-র মন্তব্য পুনর্বিচারের অপেক্ষা রাখে; তার ওপর নির্ভর করা ঠিক বিজ্ঞানসম্মত ও নিরাপদ নয়;—অবশ্য কিম্বদন্তীর অন্তর্নিহিত সংকেতের সঙ্গে ইতিহাসের ইঙ্গিতের সামঞ্জস্য বিস্তৃততর গবেষণার অনুকূল।

বর্তমান গ্রন্থের আলোচনার (সম্পাদকীয়) আরম্ভ ভারতচন্দ্র থেকে—এই কালানুক্রমিক পদ্ধতি যুক্তিসিদ্ধ, সন্দেহ নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে গভীরতর রসাস্বাদনের পরিবর্তে বুদ্ধিগত শিল্পচর্চার প্রমাণ আছে। কিন্তু তার কারণ কি? ভবতোষ দত্ত বলেছেন, অনিশ্চিত রাষ্ট্রবিন্যাস ও ভৌমিক ব্যবস্থায় সমসাময়িক রাজাদের স্থায়িত্বের ভরসা ছিলো না; নিশ্চিন্ত কলাচর্চার অবসর নষ্ট করে দিয়েছিলো নতুন জীবনযাত্রার আর্থিক চিন্তা—ফলে তাঁদের আশ্রয়ে রচিত কাব্যে ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের জন্য ভাষার চাকচিক্য, অনুপ্রাস ও ছন্দের চমক প্রবেশ করলো। কিন্তু রাজাদের আশ্রিত কবিদের কাছে কি শুধু উদ্বিগ্ন সামন্ততান্ত্রিক জীবনের চটুল রসপিপাসার দাবিই ধরা পড়েছিলো, না মুর্শিদকুলী খাঁর রাজস্বসংক্রান্ত নতুন বিলিব্যবস্থায় গড়ে-ওঠা ঐতিহ্যবিহীন জমিদার-তালুকদারদের লঘুচিত্তের দাবিও স্বীকৃত হয়েছিলো? আর যদি পুরনো আমলের ধ্বংসোন্মুখ রাজতন্ত্রই ভারতচন্দ্রের কাব্যের অগভীরতার কারণ হয়ে থাকে, তবে মিথিলার সভাকবি বিদ্যাপতির চটুল ও চতুর পদাবলীর মর্মমূল খুঁজবো কোন্ রাষ্ট্রনৈতিক ও ভৌমিক ব্যবস্থার অনিশ্চয়তায়? তবে কি পূর্বাপর

সভা-সাহিত্যে (court-literature) যে চটকদার বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে, ভারতচন্দ্রেও তার ব্যতিক্রম নেই? বস্তুতঃ ভারতচন্দ্রের কাব্যের অগভীরতার উৎস শুধু সমসাময়িক সামন্ত-তান্ত্রিক ক্ষয়িষ্ণুতায় না খুঁজে অন্য স্থানে খোঁজাও উচিত কিনা শ্রীযুক্ত দত্তকে ভেবে দেখতে বলি। অবশ্য তথাকথিত রাজসভার কবি হয়েও যাঁদের (যেমন মুকুন্দরাম) জীবনের মর্মমূল গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত; তাঁদের সম্পর্কে এ প্রশ্ন ওঠে না।

রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরে প্রচলিত কাব্যকলার উত্তরসাধক হলেও গানে তিনি সুর-স্বাতন্ত্র্যে নিঃসঙ্গ-নির্জন। তাঁর এই নিভৃত হৃদয়ের একান্ত সাধনার সত্যিই কি কারণ ছিলো? দুঃখকে আভরণ করেছেন যিনি, সমাজ সংসারের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর ওপর কল্পনা করা কঠিন। তাই ভবতোষ দত্ত সংগতভাবেই রামপ্রসাদের ব্যক্তিগত ভাবব্যাকুলতার অর্থ খুঁজেছেন কবির সামাজিক নৈঃসঙ্গে, তাঁর আত্মিক একাকীত্বে। পারিপার্শ্বিক সমাজে মনের আশ্রয়স্থল খুঁজে পাননি বলেই হয়তো নিজের মনে তিনি গান গেয়ে গেছেন। সম্পাদকের সন্ধানী দৃষ্টি বেশি পড়েছে নিধুবাবুর টপ্পা ও কবিগানের বিশ্লেষণে। রামনিধির গানে আছে বাঙালীর আত্ম-আবিষ্কারের ক্ষীণ সূচনা—তাঁর সংগীতেই প্রথম ফুটে উঠেছে মানব-হৃদয়ের অপরিমেয় সম্ভাবনা—ধর্ম ও শাস্ত্রের বন্ধন থেকে তিনিই প্রথম প্রেমকে মুক্তি দিয়েছেন। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের পথে বুর্জোয়াতন্ত্রের উন্মেষের দিনে জাতির মানসিক ভাব পরিবর্তনের আভাস তাঁর গানে পরিস্ফুট।

কবিগানের ভূমিকায় অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের মন্তব্য উদ্ধৃতির যোগ্য—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে 'জীবনের নিশ্চিন্ত অবসরের দিন চলে গিয়েছে। সাধারণ প্রজাদের মধ্যে এল প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রাম আর যাঁরা অলস অবসরে মঙ্গল-কাব্য শুনবেন, তাঁদের দুর্দশাও চরমে এসে পৌঁছল।...জমিদারদের প্রতিপত্তি যেমন ক্ষয় পেতে থাকল, নতুন এক বিত্তবান সম্প্রদায় সেই প্রতিপত্তিকে নিজেদের মতো করে ফিরিয়ে আনল। এই সব দেওয়ান ও বেনিয়ানদের অর্থ সঞ্চিত হতে থাকলে সমাজের সংস্কৃতি রক্ষার ভার তাঁদের হাতেই চলে গেল।...ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে ভূমিহীন কৃষিবঞ্চিত নীচুশ্রেণীর একদল ব্যক্তি কোম্পানীর প্রসাদপুষ্ট ধনীদের সন্তোষ বিধানে কবিগানের প্রবর্তন করেন।' এইভাবে আঠারো শতকের শেষাংশে প্রাণহীন কাব্যচর্চার পটভূমিকায় কবিগানের রূপবন্ধে লোকজীবনের স্থূল রস-পিপাসা প্রকাশের জের চললো উনিশ শতকের ঈশ্বর গুপ্তের যুগ পর্যন্ত। গুপ্তকবি কবিগানের অমার্জিত উত্তরাধিকার অস্বীকার করেননি—তিনি নিজেও ছিলেন কবি ও আখড়াই গানের বাঁধনদার।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমসাময়িক রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক পরিপ্রেক্ষায় একশ বছরের বাঙলা কাব্যের একটা সুচিন্তিত ক্রমবিন্যাস এবং যুক্তিসিদ্ধ আলোচনার কৃতিত্ব ভবতোষ দত্তের প্রাপ্য। অপরিসীম শ্রমের স্বাক্ষরে বর্তমান গ্রন্থখানি সমুজ্জ্বল। আনুষঙ্গিক তথ্য, কবিওয়ালাদের শিষ্যপরম্পরা, পরিশিষ্টে উল্লিখিত কবিদের পরিচয়, ঈশ্বর গুপ্ত-সংগৃহীত গানের সূচী, সর্বোপরি অবতারণা ইত্যাদি অধ্যায়গুলি তার প্রমাণ।

জীবেন্দ্র সিংহরায়

The Springing Tiger *By* Hugh Toye. Cassell. London. 25s.

দেশ স্বাধীন হবার পর একটি দশক অতিক্রান্ত, তবু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনো বিস্তৃত ইতিহাস আজও লেখা হল না। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকার প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। এই রাজনীতি এখন আর শুধুমাত্র বিদেশী শাসন-মুক্তির জন্য সংগ্রাম নয়। সামাজিক সমস্যাগুলির সমূল উৎখাত প্রাথমিক করণীয় বিষয়। এ-কাজের সুষ্ঠুতা কয়েকটি পূর্ব-সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। এবং স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়, ইতিহাসের কয়েকটি ধারা উপধারা বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

ক্ষোভের কথা, ভারতীয় কোনো নেতৃত্বের অনুরূপ আলোচনার একান্ত অভাব। যে-কাজ আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি, সে-কাজে দু একজন বিদেশী হাত দিয়েছেন। এবং স্থান-বিশেষে যথেষ্ট সার্থকতার পরিচয়ও প্রদান করেছেন। হিউ টোয়ীর লেখা *The Springing Tiger* এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি মূলত সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কিত বিশদ আলোচনার ভূমিকামাত্র। কারণ এই আলোচনা অধিকতর বিস্তৃতির অপেক্ষা রাখে।

স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে টোয়ীর সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বিশেষ কোনো দুর্বলতা ছিল না। এমন কি স্থানে স্থানে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর উক্তি তির্যক। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় হল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিকাংশই যারা পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষে যে-প্রচণ্ড ব্রিটিশ বিদ্বেষ একদা জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণার উৎস স্বরূপ পরিগণিত হয়েছিল, তার কারণ নির্ণয় করা। আর এই কারণ অন্বেষণ বর্তমান ব্রিটেনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে আফ্রিকায় তাদের আধিপত্য আজ শিথিলপ্রায়। আফ্রিকার অধিবাসীগণও আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাগ্রসর। অবশ্য হিউ টোয়ী এই প্রসঙ্গে কথঞ্চিৎ মানসিক জড়তার প্রশ্রয় দিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর লেখায় সামাজিক রূপান্তরের কার্য-কারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণের প্রয়াসও অনুপস্থিত।

আর এই বিচ্ছিন্নদৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ব্যর্থতাস্বরূপ বলেছেন :

The consequences in India were twenty-seven years of racial conflict, borne, not by the men of 1919 in India, but by the British people who eventually, in disgust, ended it.

This may then be the lesson of Amritsar, the lesson of Subhaschandra Bose, the lesson of India. Racial prejudice breeds racial hatred ; racial hatred breeds hysteria and racial conflict. Social equality as between governor and governed—the equality of the railway train, the hotel, the school, the restaurant—may be more important than the transference of power. If racial prejudice can be eliminated—and constant pressure from home may be needed to secure this—tolerance and goodwill may work to produce the steady, unhindered political progress, that is in the real interest of all. The lesson is inescapable ; it has not yet been learned (p. 184.)

হিউ টোয়ীর এই খেদোক্তি অবশ্যই ব্রিটিশ শাসকবর্গের অনুধাবণযোগ্য। এবং এই কথা অনস্বীকার্য যে, উপরিউক্ত মন্তব্যের সময় আফ্রিকাই লেখকের সামনে ছিল। আর এই উক্তি লেখকের অজ্ঞতারই সূচক। কোনো দেশের সমাজ ব্যবস্থা এক বিশেষ বৃত্তে স্থিত থাকতে পারে না। অন্তর্নিহিত সংঘাতের ফলে অনিবার্যরূপেই সমাজের গতি অন্যমুখী। আর শেষ বিচারে অবশ্যই প্রমাণিত হবে এর কারণ অর্থনৈতিক। বর্ণবিদ্বেষ অথবা তজ্জনিত কোনো হেতু ইতিহাসের এই নির্দিষ্ট গতিকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র।

যদিও হিউ টোয়ী তাঁর বক্তব্য থেকে ব্রিটিশ শাসকবর্গকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলছেন এবং এটি-ই তাঁর প্রধান বক্তব্য, কিন্তু বইটির আলোচনা মূলত সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে। তাঁর অনুমান ও সিদ্ধান্ত প্রাসঙ্গিক মাত্র।

যে-সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে, তা মোটামুটি সত্য। কারণ টোয়ী একজন ইনটেলিজেন্স অফিসার ছিলেন। তাঁর পক্ষে বিভিন্ন দলিল ও নথিপত্রের সাহায্য গ্রহণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। যদিও জাপানী আত্মসমর্পণের পর অনেক দলিল ধ্বংস করা হয়েছে। লেখক তাঁর ভূমিকাতে বলছেন :

In 1949 I started to write an exhaustive factual account of the Indian Independence movement which flourished under German and Japanese patronage during the second World War. The work took five years got me the reputation of a troglodyte, and was quite unreadable. Here I have tried to tell the same story through a study of Mr. Subhaschandra Bose, the Indian revolutionary nationalist who dominated the whole affair.

এই বিষয়ে তিনি বহুলাংশে সততার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে, শৈশব থেকে জীবনের পরবর্তীকাল পর্যন্ত, সুভাষচন্দ্রের জাতীয় চেতনা কিভাবে পরিণতি লাভ করে, লেখক তার নির্ভরযোগ্য বিবরণ দিয়েছেন।

স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হবে যে, সুভাষচন্দ্রের জাতীয় চেতনা, তাঁর আপোষবিরোধী মনোভাব মূলত ব্রিটিশ বিদ্বেষ প্রসূত। তাই বিলেতে একজন ইংরেজ যখন তাঁর জুতো পরিষ্কার করেছিল, তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর এই উক্তি কতটুকু শোভন তা নিয়ে তর্কের অবতারণা সম্ভব। কিন্তু তাঁর উক্তি যে প্রচণ্ড ব্রিটিশ বিদ্বেষ হতে উৎসারিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর এই বিদ্বেষ ক্রমশ যে এক বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদে সংহত হয়েছে, তার কারণ তাঁর জীবনের প্রথম দিকের ঘটনাবলী। বিশ শতকের প্রারম্ভিক ইতিহাস হল সন্ত্রাসবাদ, ধর্ম আন্দোলন এবং সর্বোপরি বঙ্গ ভঙ্গ। এবং যেহেতু সুভাষচন্দ্র নিজে কোনো কায়েমী-স্বার্থসম্পন্ন পরিবার থেকে আসেননি, সে কারণেই তাঁর পক্ষে এই সকল দেশব্যাপী ঘটনাবলী থেকে যা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার কদর্যরূপ তুলে ধরে, ঘুরে দাঁড়ান সম্ভব ছিল না। যে কোনো বুদ্ধিজীবি ভারতীয়ের মনে তদানীন্তন ঘটনাবলী প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে বাধ্য। সুভাষচন্দ্রের পরিবারও এ-থেকে মুক্ত ছিলেন না।

দেশের এই জাতীয় চেতনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ দমননীতি কদর্য থেকে কদর্যতর রূপ গ্রহণ করল। আর শাসক শ্রেণীর সুসংগঠিত পুলিশ, সৈন্যবাহিনী ও আমলা-তন্ত্রের সাহায্যে বারবার জাতীয় চেতনার উৎস ব্যাহত হয়েছে। ফলত কোনো কোনো জাতীয় নেতার পক্ষে এ সিদ্ধান্তে আসাই স্বাভাবিক যে দেশের স্বাধীনতা কোনো শান্তিপূর্ণ

উপায়ে অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এই স্থির প্রত্যয়ে উপনীত হওয়া স্বাভাবিক :

"Only military power actual or potential could drive out the British." ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে সুভাষচন্দ্রের কার্যাবলী এই ধারণার পরিণত ফলাফল। তাঁর পরবর্তী জীবনে কংগ্রেস নেতৃত্ব ও গান্ধীজীর বিরোধীতার মূলও এই ধারণার মধ্যেই নিহিত।

তাঁর রাজনৈতিক চেতনার বৃশ্চির সংগে সংগে পরবর্তী কালে আরো একটি ধারণার সংযোজনা হল। সেটি হল সমাজতন্ত্রবাদ। তিনি বারে বারে ঘোষণা করেছেন স্বাধীনতা লাভের পর দেশের গঠন হবে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে।

সুভাষচন্দ্রের জীবনের উল্লিখিত দুটি মূল সূত্র রূপায়িত হল ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠনে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজে। কংগ্রেস নেতৃত্বের সংগে কেবলমাত্র একবারই সুভাষচন্দ্র একমত হয়েছিলেন। তা হল ১৯৪২ সালে। যখন 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কোনো ধারাবাহিক পূর্ণাংগ ইতিহাস আমাদের জানা নেই। আলোচ্য গ্রন্থটি সেই দিক থেকে মূল্যবান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের জনমানসে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটানোর এক অসংকোচ প্রয়াসের সাম্য মেলে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে অনেককাল আগে। তথাপি আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেকেই নানা সন্দেহে সমাহিত। এই সন্দেহ ছিল, উক্ত সেনাবাহিনীর স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে। সে সন্দেহের নিরসন অনেকাংশে হিউ টোয়ী করেছেন। তাঁর মতে আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং স্বাধীন ভারতের সামরিক সরকার নীতির দিক থেকে স্বতন্ত্রভাবেই কাজ করেছে। জাপানের সংগে তাদের একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল মাত্র। যে-চুক্তি অনুসারে জাপান ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ সরকারকে সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছিল। ব্যাংকক প্রস্তাব উদ্ধৃত করে লেখক তাঁর এই বক্তব্য প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী কালে সুভাষচন্দ্র একাধিক ঘোষণায় এই নীতির উল্লেখ করেছেন এবং ইউরোপে থাকাকালীন বহুবার ব্রিশক্তি কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও হিটলার তাঁর এই প্রস্তাবে রাজী হয়নি। তার কারণ হিটলারের মনে তখন রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা। এই জন্যই ইউরোপ থেকে সুভাষচন্দ্রের দূরপ্রাচ্যে আগমন ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ। এই প্রসংগে টোয়ীর মন্তব্য স্মর্তব্য।

"He was no axis apologist; his concern was with India and India's freedom: when his task was done he would return home." (p. 68.)

সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা ছিল, ভারতবর্ষের এক প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের স্বীকৃতি অর্জন করা। মুসোলিনী এই প্রস্তাবের সারবত্তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

"Mussolini allowed himself to be persuaded by arguments produced by Bose to obtain a tripartite declaration in favour of Indian independence." (p. 66, quoted from Ciano's Diary, p. 465.)

কিন্তু হিটলার এই প্রস্তাবের পরিপন্থী। তাঁর মনোভাব গোয়েবল্‌স্‌-এর ডায়েরীতে পাওয়া যায়।

"We don't like this idea very much, since we do not think the

time has yet come for such a political manoeuver. It does appear though that Japanese are very eager for some such step. However, emigre Government must not live long in a vacuam. Unless they have some actuality to support them, they only exist in the realm of theory (p. 66). জাপান যে সত্য প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের অস্তিত্ব স্বীকারে আগ্রহশীল ছিল, তার প্রমাণ মেলে ১৯৪৩ সালের ১৬ই জুন তারিখে ডায়েটে প্রদত্ত তোজোর বক্তৃতায়।

"Japan is firmly resolved to extend all means in order to help to expel and eliminate from India the Anglo-Saxon influences which are the enemy of the Indian people and enable India to achieve full independence in the true sense of the term. (p. 79.)

আজাদ হিন্দ ফৌজের পরবর্তী কর্মপন্থা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করেছে। এমন কি ভারতীয়দের কাছ থেকেই এইজন্য অর্থ সংগৃহীত হয়েছে।

টোয়ীর মতে এতৎসত্ত্বেও আজাদ হিন্দ বাহিনীর ব্যর্থতার কারণ হল : সৈন্যবাহিনীর সদস্যদের ভীরু এবং দুর্বল চিত্ত। এদের অধিকাংশই দ্বিতীয় শ্রেণীর সৈনিক এবং এদের মধ্যে জাতীয় চেতনার অভাব। দ্বিতীয়ত এবং এটিই প্রধান, জাপানের আত্মসমর্পণ।

পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে শ্রমিকদলের মন্ত্রীত্বকালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। গ্রন্থকারের মতে :

"There can thus be little doubt that the Indian National Army not in its unhappy career on the battlefield, but in its thunderous disintegration, hastened the end of British rule in India." (p 175.)

টোয়ীর মতে, অনেক ত্রুটি এবং বিচ্যুতি সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য অক্ষশক্তির সহায়তা লাভ করে তিনি ক্রমশই প্রবলতম একনায়কত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন বলেই লেখকের ধারণা। তবু তাঁর মতে তা সমর্থনযোগ্য।

"Nor could anything but autocracy accomplish those reforms: the ills were too deep rooted in too many vested interests. (p. 180.)

দুঃখের কথা, টোয়ী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতাদর্শের কোনো আলোচনা করেননি। প্রসংগত তিনি *Indian Struggle* থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, সাম্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদের এক সমন্বয়ের তিনি পরিপোষক। কিন্তু তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস ভিন্ন। এবং "ফরওয়ার্ড ব্লক" পত্রিকায় সুভাষচন্দ্রের কয়েকটি সম্পাদকীয় পাঠ করার সুযোগ গ্রহণ করলে গ্রন্থকার উপকৃত হতেন। একটি সম্পাদকীয়তে তো তিনি স্পষ্টতই প্রাঞ্জল ভাষায় ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্দেশ্য ঘোষণা করে লিখেছেন, ভবিষ্যৎ একটি মার্কস্‌বাদী দলের ভিত্তি হল ফরওয়ার্ড ব্লক।

অবশ্য এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না, সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদী ছিলেন। কারণ তিনি জার্মাণীতে অবস্থান কালে প্রায়শই বলতেন, ভারতবর্ষে প্রয়োজন একজন কামাল পাশার। তাছাড়া ধর্মবিশ্বাস তাঁর জীবনে অত্যন্ত প্রগাঢ় প্রভাব ফেলেছিল। যার স্বাক্ষর তাঁর পরবর্তী কর্মধারায় স্পষ্ট। অথচ তিনি মার্কসবাদ বিরোধীও ছিলেন না। বস্তুত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের

সংগঠন সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অপরিণত। তাই তিনি তাঁর সমন্বয়বাদে বলেছিলেন, সাম্যবাদের অর্থনৈতিক আদর্শ ও ফ্যাসিবাদের সাংগঠনিক শক্তির সমন্বয়ই হল তাঁর আদর্শ। অথচ এই বক্তব্যও তাঁর পরবর্তী জীবনে প্রাধান্য লাভ করেনি। তিনি ভারতবর্ষে একজন কামাল পাশা চেয়েছিলেন।

"Bose's belief in an authoritarian government for India has grown up in the West, but his model was the Turkish regime of Mustapha Kemal who seemed to have faced the same problems of social adaptation that confronted India and not the Nazi or Fascist caricatures."

হিউ টোয়ীর গ্রন্থটি পাঠ করে মনে হয়, এক আকস্মিক ঘটনার প্রভাবে আমরা আজাদ হিন্দ সরকারের এবং এর নেতা সুভাষচন্দ্রের বর্তমান চিত্র পাই। দেশত্যাগের পর তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য যদি সফল হত, তাহলে সমস্ত ইতিহাসই ভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করত। দেশত্যাগের পর সুভাষচন্দ্র প্রথমে রুশ দূতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত, যুদ্ধে মিত্র শক্তির জয়ের পরেও তাঁর এই বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি রাশিয়ার সাহায্য লাভ করবেন। কিন্তু প্রথমবার তিনি ব্যর্থ হবেন।

পরবর্তী সময়ে, জাপান আত্মসমর্পণ করার পর আবার তিনি রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করায় সচেষ্ট হন।

"The Japanese again . . . rejected his request for contact with Russia, but might there not be chances in the confusion of the next few days to seek asylum there?" (p. 165.)

কারণ যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষচন্দ্র নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও নির্ধারিত করেছিলেন।

"Even now as in 1940 death had seemed better than passivity in prison . . . The British had won the war, and would presumably have their will of India, but the right course for India was still the same—resistance within, armed struggle without and international diplomacy."

সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী পরিকল্পনা উক্ত নীতিরই অনুসৃতি। সে কারণেই তাঁর পক্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থাবান থাকা সম্ভব হয়নি।

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে টোয়ী নিশ্চিত। তাঁর মতে ১৯৪৫ সালের ১৮ই অগস্ট তারিখে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে। এবং তাঁর এই বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য এবং তথ্যনির্ভর।

গ্রন্থটির শেষ পরিচ্ছেদে যখন টোয়ী অনেক তির্যক মন্তব্যের পর লিখছেন :

"By the magnitude of this conception, by the example of his magnetic, burning zeal, his tenacity and personal force, by the tradition be left he left of sacrificial patriotism, must be measured the stature of Subhaschandra Bose. His place in Indian history cannot be denied." (p. 180.) তখন সকলেই লেখকের সঙ্গে একমত হবেন।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

প্রাচীন

ঐতিহ্যের

ধারা-বাহক

অজন্তা ও এলোরা, খাজুরাহো ও ভুবনেশ্বর গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ভারতের জীবন্ত সাক্ষ্য, প্রাচীনভারতীয় শিল্পকলার চরমোৎকর্ষের নিদর্শন। আধুনিক ভারতের শিল্পধারা ও জে. কে-র শিল্পনৈপুণ্যের সমন্বয়ে তৈরি জিনিসপত্র সৃষ্টিশীল সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় নির্মাণশৈলীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

ঐতিহ্যের প্রতীক

J. K. ORGANISATION KANPUR — BOMBAY — CALCUTTA

চতুরঙ্গ

—ত্রৈমাসিক পত্রিকা—

নিয়মাবলী—বৈশাখ হইতে বর্ষ সুরু করিয়া প্রত্যেক তৃতীয় মাসে অর্থাৎ আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র মাসে "চতুরঙ্গ" প্রকাশিত হয়। মূল্য বার্ষিক সডাক (ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান) ৫.৫০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। বৈদেশিক ১০ শিলিং।

"চতুরঙ্গ"-এ প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার। প্রাপ্ত রচনা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার কোন বাধ্যতা থাকিবে না। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

১০ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য ১.২০ টাকা আগে পাঠানো প্রয়োজন শতকরা ২৫% টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

বিনামূল্যে নমুনা সংখ্যা পাঠানো হয় না। নমুনার জন্যে ১.৫০ টাকা পাঠাতে হয়।

৫৪, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা-১৩